স্বস্তিকা

দাম : সাত টাকা
৬৪ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।।
১১ জুন - ২০১২।।
২৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৯।।

শিক্ষার মৌলিক অধিকার

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

সাংবাদিকতার নামে এখন 'দালালরাজ' চলছে □ ৯

শাহরুখকে নিয়ে মাতামাতি রাজ্যবাসী ভাল চোখে নেননি □ ১০

খোলা চিঠি : ডান্স বাংলা ডান্স, এটাই এখন রাজ্যের 'থিম সঙ্' □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

লোকপাল বিলকে ঠেকিয়ে রাখতে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হলো □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১২

আর টি ই এবং সংখ্যালঘুদের উদাসীনতা □ রামমাধব □ ১৪

শিক্ষার অধিকার : কিছু কথা □ অনির্বাণ নিয়োগী □ ১৬

'সবার জন্য শিক্ষা' খাতায়-কলমেই : বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে □ বাসুদেব পাল □ ১৭

শোভাবাজার রাজবাড়ি — ছোট তরফ : দুর্গোৎসব □ অর্ণব নাগ □ ২১

লালগড়ের জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রী রাধামোহন জীউ □ বাসুদেব পাল □ ২২

তীর্থযাত্রা গয়া □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২৩

বিজ্ঞানের মহাকাশে এক জ্যোতিষ্ক মাদাম ক্যুরি □ যোগমায়া বসু □ ২৬

বুদ্ধিজীবী উপাখ্যান □ নটরাজ ভারতী □ ২৭

এবার কেন্দ্র বাংলাদেশ : লক্ষ্য মোগলস্তান □ মুজফ্‌ফর হোসেন □ ২৮

বহু ঢক্কানিনাদের 'মনরেগা'য় ব্যাপক অনিয়ম উত্তরপ্রদেশে □ ৩০

ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করছে আওয়ামি লিগ নেতারা □ ৩১

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে অসম সরকার ১০ মাসে খরচ করেছে মাত্র ৪৪ শতাংশ □ ৩২

ভারত বন্‌ধ ও তারপর □ শ্যামল কুমার হাতি □ ৩৬

বহির্বিশ্বে ভারত-ঐতিহ্যের প্রতিভূ বিশ্বনাথন আনন্দ □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □

সমাবেশ-সমাচার : ৩৫ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১১ জুন - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শিক্ষার মৌলিক অধিকার
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬

হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : শরীরং রথমেব তু

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম— আমাদের এ এক অতি পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু শরীরই যে রথ— এ উপলব্ধি আমাদের কখনও হয়েছে কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং রথ টেনেছিলেন বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে। রথ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা আমাদের দেহ-মন্দিরকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। লিখেছেন — **নবকুমার ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।**

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য বিষয়ও।

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ২ জুলাই, ২০১২

যে কাশ্মীরকে ভারতে পূর্ণ বিলয়ের দাবিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আত্মবলিদান করেছিলেন, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে আমাদের জাতীয় নেতাদের দূরদর্শিতার অভাব ও ঔদাসীন্যই কাশ্মীর এখনও আমাদের গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদানকেও। এসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন তথাগত রায়, ও পি গুপ্ত প্রমুখ। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে থাকছে নানা তথ্য। সব মিলিয়ে এক সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।

২২ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।
দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

স্বস্তিকা

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ২৫ জুন, ২০১২

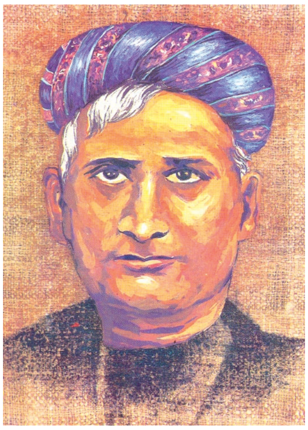

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পুনরুত্থানের অন্যতম পুরোধাপুরুষ। একই সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক। বঙ্গসাহিত্য স্রোতধারার তিনি ভগীরথ। আবার শাসনের কঠিন কঠোর বাতাসে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণের ধূম ও ভস্মরাশিও নিবারিত করেছেন। তখন তিনি কঠোর সমালোচক, সম্পাদক। তাঁর একশ পঁচাত্তর বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধার্ঘ্য— **বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ সংখ্যা।**

লিখছেন : ড- অচিন্ত্য বিশ্বাস, ডঃ অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী চক্রবর্তী।

১৫ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।
দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইউপিএ-২ আর্থিক ক্ষেত্রে ডাহা ফেল

ইউপিএ-২ সরকারের ক্ষমতাসীন হইবার সময়ে দেশের আর্থিক উন্নয়ন সূচক মোটামুটি ছিল। কিন্তু গত তিন বছরে ইউপিএ-র শাসনকালে শিল্পোৎপাদনের হারের ক্রমাবনতির সঙ্গেই টাকার ক্রমাগত পতনের ফলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির খতিয়ান নিম্নাভিমুখী। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার নামিয়া আসিয়াছে ৬.৫ শতাংশে। গত নয় বছরে যাহা সর্ব নিম্ন।

দেশের এই বেহাল আর্থিক দশার জন্য কেন্দ্র সরকারের দিকেই আঙুল তুলিয়াছে শিল্পমহল। জোটের রাজনীতি ও দুর্নীতির অভিযোগে বেসামাল কেন্দ্র যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ তাহা স্পষ্ট। চড়া সুদের হার; নগদ জোগানের অভাব, অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হারের জন্য পড়তি চাহিদা, টাকার পতন, রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা ইত্যাদি শিল্পোৎপাদনের পথে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপের আর্থিক সংকট এবং ভারতের ঘরোয়া অর্থনীতিতে দৈনন্দিন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দেশের অর্থব্যবস্থাকে নড়বড়ে করিয়া দিয়াছে। কয়েকটি রাজ্য সরকারের এবং ইউ পি এ-র কয়েকটি শরিক দলের বিরোধিতার কারণে বেশকিছু আর্থিক সংস্কার গত তিনবছর যাবৎ আটকাইয়া আছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এবং বিক্রয়কর যুক্তিগ্রাহ্য করা, সারাদেশেই পরোক্ষ করব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার, গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্সও রাজ্যগুলোর বাধা দেওয়ার কারণে কার্যকর হয় নাই। আয়কর পরিকাঠামোয় পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যক্ষ করনীতিতে সংস্কারও (বিভিন্ন সুপারিশ সহ) একই কারণে কার্যকর হয় নাই।

দেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার কোনওরকম ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বীমা এবং বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফ ডি আই)-এর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়েও সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগিতেছে। গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্কার সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সংসদে সরকারকে বিশেষ কোনও উদ্যোগ লইতে দেখা যায় নাই। এইসবগুলির মধ্যে মাইক্রো ফাইনান্স ইনস্টিটিউশন (নিয়ম ও বিস্তার), জাতীয় আবাস ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন, ভারতীয় লঘু উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (সংশোধিত), রাষ্ট্রীয় কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইন, ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সংশোধন), ঋণদান আইন সংস্কার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া গত তিন বছরে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তেরো বার নীতিগতভাবে জমার হার বৃদ্ধি করিয়াছে। ফলে বিবিধ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রভাব পড়িতেছে।

গত এপ্রিল মাসেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ এবং মুদ্রানীতি ঘোষণার সময়ে স্বল্পকালীন ঋণ-এর ক্ষেত্রে ১/২ শতাংশ সুদ কমাইয়া একটু স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও দিন দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণে সুদ আরও কমাইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভারতের এই আর্থিক বেহাল দশা অনেকটা শ্বাসরোধ হইয়া আসা হাতির মতো। এদিকে অর্থমন্ত্রকের প্রধান আর্থিক পরামর্শদাতা কৌশিক বসুর একটি মন্তব্যে এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য— ‘‘জোট সরকার সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনের পরই সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে গতি আসিবে।’’ অর্থাৎ মনমোহন সরকারের দিশাহীন আর্থিক নীতি এবং সেইসঙ্গে জোট সরকারের বাধ্যবাধকতার কারণে দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সরকার যতদিন থাকিবে ততদিন এই আর্থিক বেহাল দশা হইতে পরিত্রাণের কোনও পথ নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?’ আমি বলিলাম, পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত আমার নিকট এখন তীর্থস্বরূপ। ইহা ব্যতীত আর কোনও উত্তর আমার মনে আসিল না।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বিজেপি বিরোধীরা পুরস্কৃত

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সমিতিতে তিস্তা ও শবনম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এবার কেন্দ্র সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতির সদস্য হিসেবে মনোনীত হলেন তিস্তা জাভেদ শীতলাবাদ এবং শবনম্ হাসমি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে তাঁদের নাম ওই সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, চরম বিজেপি বিরোধিতা ও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাবার জন্যই তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

তিস্তা শীতলাবাদ

গুজরাটের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তিস্তা বিরামহীনভাবে তীব্র অপপ্রচার চালিয়ে গেছেন। তবে তিস্তা জাভেদের প্রচার ব্যুমেরাং হয় যখন তাঁরই প্রাক্তন সহায়ক রইস খাঁন পাঠান সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি কাঁটা-ছেঁড়া করার অভিযোগ করেন। গোধরায় ট্রেন জ্বালানোর পরবর্তী দাঙ্গার অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি স্পর্শকাতর মামলায় তিস্তা জালিয়াতি করেছিলেন বলে হলফনামাতে দাবি করা হয়েছিল।

অপরপক্ষে শবনম্ হাসমি সমাজকর্মী আন্না হাজারের বিরুদ্ধে প্রচারে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবালের সুরে সুর মিলিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আন্না হাজারে এবং তাঁর দলবল কেন্দ্র সরকারকে যতটা নাকানিচোবানি খাইয়েছেন 'লোকপাল' ও 'বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা'র ইস্যুতে ততটা সংসদে বিরোধীরাও করে দেখাতে পারেননি।

সেজন্য কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে এরকম পুরস্কার তিস্তা জাভেদ এবং শবনমদের একরকম প্রাপ্য ছিল বলা যেতে পারে। এখন থেকে তারা দুজনেই সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ্ এডুকেশন (সি এ বি ই)-এর সদস্যা। আর কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নিজেই ওই বোর্ডের মাথা। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'দি পাইওনীয়র' পত্রিকাকে এক প্রশ্নের উত্তরে কপিল সিব্বাল জানিয়েছেন, তিস্তা ও শবনম্ মন্ত্রকের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের উপদেষ্টাদের প্যানেলে পরামর্শ দেওয়ার জন্য রয়েছেন। ওঁদের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য— "তাঁদের বিরাট অবদান আছে এবং কার্যকালে তাঁদের কাছ এরকমই অবদান আমরা আশা করি। অবশ্য আরও কিছু নতুন নামও রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, নবগঠিত সমিতি দেশে শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে মাঝে মাঝেই পরামর্শ দিতে থাকবেন। এঁদের নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। শিক্ষার উন্নয়ন জাতীয় শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করে।"

কপিল সিবাল

সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ্ এডুকেশনে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন দপ্তরের দুই প্রতিবেশী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্য এগারোজন মন্ত্রী। আরও রয়েছেন বিভিন্ন নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অন্য কিছু সম্মানিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর এবং শ্যাম বেনেগাল-এর মতো স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক। গত ১৮ মে নতুন সমিতি গঠন করা হয়েছে। ১৯২০ সাল থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই কমিটি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

শবনম

মন্ত্রকের অফিসাররা কারও প্রতি টান অথবা বৈমনস্য ছাড়াই বলেছেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিরা সমিতিতেও যুক্ত হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো উন্নত হয়। ২০০৮-এ সি এ বি ই পুনর্গঠিত হয়েছিল পরবর্তী তিন বছরের জন্য। যা গত ডিসেম্বরে শেষ হয়। কমিটিতে লোকসভা থেকে চারজন এবং রাজ্যসভা থেকে দুজন সংসদ সদস্য থাকার কথা। এঁদের নাম এখনও অবধি ঘোষণা করা হয়নি। অন্যদের মধ্যে আছেন— দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীনেশ সিংহ, এইচ সি এল কোম্পানীর শিব নাদার, ম্যাক্স হাসপাতাল সমূহের চেয়ারম্যান অনলজিৎ সিংহ, ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ, চিত্র-পরিচালক শ্যাম বেনেগাল, উর্দুর অধ্যাপক ওয়াসিম বয়েলবি এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি বিনোদ দুয়া প্রমুখ।

জেলা প্রশাসন থেকে ইমামদের ভাতা দেওয়া হলো মালদায়

বিশেষ প্রতিনিধি : মালদা॥ উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় আসার আগেই মালদা জেলাতে সংবিধান বিরোধী ইমাম ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। গত ৩০ মে জেলা প্রশাসনিক ভবনে ঘটা করে জেলার ২০০৫ জনের জন্য ৭৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৫৮ টাকার চেক প্রদান করতে ইমামদের ডাকা হয়। ২০০০ মসজিদের জন্য এই অর্থ এসেছে বলে বলা হলেও জেলায় কত মসজিদ এবং তার ইমাম সংখ্যা কত তার কোনও হিসাব প্রশাসনের কাছে নেই। ইংলিশবাজারের বি ডি ও জানিয়েছেন, ইমামের সংখ্যা আরও বাড়বে। এক একটি গ্রামে ৪টি করে মসজিদ রয়েছে, সেই হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মালদা জেলাতে ৪ হাজারেরও বেশি মসজিদ এবং তাদের ইমামদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে এবং সরকার তাদের ভাতা প্রদান করবেন।

প্রশাসনিক কনফারেন্স রুমে উপস্থিত চাঁচলের মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুল রহিম বক্সি প্রশ্ন তুললেন, ইমামদের পরিচিতি পত্র কে দেবে? আমার কাছে ইমামদের কোনও তালিকা নেই বা আমার কাছে কেউ পরিচয়পত্র নিতে আসেননি। সুজাপুরের বিধায়ক আবু নাসের খান ইমামদের উদ্দেশে বললেন, আপনারা মুসলিম সম্প্রদায়কে উন্নত করার কাজ করছেন। তার জন্যই এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ সুজাপুরে এইদিন সকালেই একজন মাদ্রাসার শিক্ষককে প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতীরা খুন করে ফেলে দিয়ে যায়। জেলাশাসক ডঃ অর্চনা জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের জন্য সংখ্যালঘু তহবিল থেকে এই ভাতা প্রদান করলেন। জেলায় মাদ্রাসা, মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ভাতা, ঋণের জন্য অর্থের কোনও অভাব হবে না। জেলায় মুসলিমরা কেন পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ সম্পর্কে কেউ কিছু বললেন না। পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ যে দারিদ্র্যের কারণ একথা বলার সাহস কোনও দলেরই এখানে দেখা গেল না। অতিরিক্ত জেলাশাসক নজরুল ইসলাম বললেন, ইমামদের সঙ্গে আল্লার সাক্ষাত যোগাযোগ থাকে। তারা সম্মানীয়। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই এই ভাতা। অথচ বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে কাজ করার জন্য ইমামদেরকে একটি কথাও তিনি বললেন না।

যতদূর জানা যায়, মসজিদে মসজিদে ছোটদের ইসলামিক শিক্ষা ও আরবী শেখানোর কিছু কাজ মৌলবীরা করে থাকে। এতে বৃহত্তর সমাজের কী উপকার হয় তা সাধারণ মানুষই বলবেন। তাছাড়া শিক্ষিত মুসলিমরা মাদ্রাসাতে এখন আর ছেলেমেয়েদের পড়াতে দিতে রাজি হচ্ছে না। অথচ রাজ্য সরকার মাদ্রাসা খোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বললেন, এই টাকা ওয়াকফ বোর্ড থেকে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি টাকা নয়। কথাটা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন হলো, তা হলে এতদিন ওয়াকফ বোর্ড কোথায় ছিল? এদিন প্রশাসনিক ভবনে যখন ইমাম ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল সেই সময় বিজেপি-র পক্ষ থেকে ইমাম ভাতা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জেলা সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ, জেলা যুব মোচার সভাপতি উজ্জ্বল পাণ্ডে সহ ৫০-৬০ জন বিজেপি কার্যকর্তা এই ভাতা প্রদান সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন— সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ইমাম ভাতা দেওয়া যদি অসাংবিধানিক হয়ে যায় তখন কি ইমামরা টাকা ফেরত দেবেন? রাজ্য সরকার সব সম্প্রদায়ের মানুষের পিছিয়ে পড়া সমাজকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন— এই আশা করে জনগণ পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে মুসলিম তোষণ কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?

সময়সীমা কমানোর বিরুদ্ধে অমরনাথ যাত্রীদের গ্রেপ্তার বরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মুতে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের বিক্ষোভ চলছেই। গত ৩ জুন জম্মুতে অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা গ্রেপ্তার বরণ করলেন। এদিনই তারা অমরনাথ গুহায় তুষার লিঙ্গ দর্শনের জন্য রওনা হয়েছিলেন। সারাদেশ থেকে প্রায় ৬০০ তীর্থযাত্রী এদিন সকালে রওনা দিলে রাজ্যের পুলিশ তাদের আটকায়। তীর্থযাত্রীরা দু' ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়।

তাদের দাবী যাত্রার সময়সীমা আগের মতোই দু' মাস করতে হবে যা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে শ্রাবণী পূর্ণিমায় শেষ হবে।

পরদিন গত ৪ জুন একই দাবীতে প্রায় ২০০ অমরনাথ তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দুই বিজেপি সাংসদ জে পি নাড্ডা ও তরুণ বিজয় গ্রেপ্তার বরণ করেন। তরুণ বিজয়-এর অভিযোগ, এস এ এস বি (অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড) অত্যাধিক তুষারপাতের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে যাত্রার সময়সীমা কমিয়ে দিয়েছে। বজরঙ্গ দলের কর্মীরা রাজ্যের রাজ্যপাল তথা এস এ এস বি-র চেয়ারম্যান এন এল ভোরা-র কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

স্থানীয় বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাদের অভিযোগ— রাজ্য সরকারের তরফে ট্রান্সপোর্ট মালিকদের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের গাড়ী তীর্থযাত্রীদের ব্যবহার করতে না দেন। এমনকী অগ্রিম দেওয়া সত্ত্বেও ট্রান্সপোর্ট মালিকরা গাড়ী দেয়নি বলে অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, এই বছর শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড (এস এ এস বি) অমরনাথ যাত্রার সময়সীমা কমিয়ে জুন মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু করে ২ আগস্ট পর্যন্ত স্থির করেছে। তীর্থযাত্রীদের অভিযোগ সরকার ও শ্রাইন বোর্ড বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চাপের কাছে মাথা নুইয়ে যাত্রার সময়সীমা কাটছাঁট করেছে। অথচ গত দু'-তিন বছর দু'-মাস ধরেই অমরনাথ দর্শনে তীর্থযাত্রীরা যেত।

ভারতের উর্দু উইকিপিডিয়ার আসল উদ্দেশ্য কি?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সামনের অক্টোবর থেকেই উর্দুতে ভারত তার উইকিপিডিয়া চালু করতে চলেছে। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধু উর্দু ভাষায় সঠিক এবং ব্যাপক তথ্য প্রদানই নয়, উর্দুতে পাকিস্তানী অপপ্রচার রোখার অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে এটি। জানা গিয়েছে, দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ উর্দু ল্যাঙ্গোয়েজ (এন সি পি ইউ এল) উর্দু উইকিপিডিয়া চালু করার প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিয়েছে এখনই। ভারত সরকারের এই প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়-সড় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি সূত্র বলছে, ভারত জেনেশুনেই উর্দু-উইকি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত জানে আন্তর্জাতিক স্তরে উর্দুর তেমন গুরুত্ব নেই এবং পাকিস্তানই প্রথম তাদের দিক দিয়ে উর্দু-উইকিপিডিয়া চালু করে। প্রশ্ন উঠছে, সরকার যখন জানেই আন্তর্জাতিক স্তরে উর্দুর গুরুত্ব নেই, তখন সেই ভাষায় এদেশের উইকিপিডিয়া চালু করা হচ্ছে কিসের স্বার্থে? দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানকে 'কাউন্টার' করার জন্য যে উর্দুভাষায় উইকিপিডিয়া চালু করার যুক্তি ভারত দিচ্ছে তা ধোপে টিকছে না। কারণ উর্দুভাষীরা পাকিস্তানী উইকিপিডিয়ায় প্রদত্ত তথ্যে বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলে ভারতীয় উইকিপিডিয়ার প্রদত্ত তথ্য তাদের যাবতীয় ভুল ভেঙ্গে দেবে বিষয়টা এমন নয়। কারণ ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়া যাঁরা ঘাঁটেন তাঁরা সবাই ইংরেজি জানেন। এঁদের 'ভুল ভাঙতে' উর্দু উইকিপিডিয়া চালুর প্রস্তাব তাই হাস্যকর। এছাড়াও উর্দুভাষাভাষীদের একটা বড় অংশই পাক-পন্থী। ভারতের উর্দু- উইকিপিডিয়ার তথ্য একশ' শতাংশ সঠিক হলেও তাই উর্দুভাষীদের গরিষ্ঠাংশের কাছেই তা প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা বেশি। একারণে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তিগুলি ধোপে টিঁকছে না বলেই এর মধ্যে দিয়ে চিরাচরিত মুসলমান তোষণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর পাশাপাশি উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি মুসলমানদের অনেক দিনেরই। প্রশ্ন উঠছে, সেই লক্ষ্যেই কি উর্দু উইকিপিডিয়া চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এন সি পি ইউ এল সূত্রে জানা গিয়েছে, উইকি-র সঙ্গে উর্দু এনসাইক্লোপিডিয়াও যুক্ত করা হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে ডিজিটালাইজড উর্দু টেক্সট 'আপলোড' করার কথাও জানানো হয়েছে এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে উর্দুতে ১২০০ টেক্সটবই আপলোড করা প্রাথমিকভাবে সম্ভব হবে বলে সংস্থাটি আশা করছে।

সাংবাদিকতার নামে এখন ‘দালালরাজ’ চলছে

কলকাতার বাংলা খবরের কাগজ এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলগুলির রাজনৈতিক স্তাবকতা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রতিদিন খবরের আড়ালে ক্ষমতাবান দলের নেতা-নেত্রীদের যেভাবে পদলেহন করা চলছে তা অতীতে বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ দেখেননি। অতীতে খবরের কাগজ এবং চ্যানেলগুলির মালিক-পরিচালকদের এমন নির্লজ্জভাবে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হতেও দেখা যায়নি। সম্প্রতি দেশজুড়ে পেট্রোলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ভারত বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বন্‌ধে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিলেন কংগ্রেস এবং তৃণমূল জোটের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই। একটা কথা মানতেই হবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এবং এনডিএ-র শরিকদলের এতটা সাংগঠনিক শক্তি নেই যে দলের কর্মী সমর্থকরা রাজ্যজুড়ে পথে নেমে বন্‌ধ সফল করতে পারে। সুতরাং বিজেপি কর্মীরা পথে নেমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বন্‌ধ সফল করেছে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে রাজ্যের মানুষ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন বললে খুব একটা ভুল হবে না। অথচ কলকাতার বাংলা কাগজে অথবা বাংলা চ্যানেলের খবরে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। সংবাদমাধ্যমে প্রতিযোগিতা চলছে কে বা কারা তিরস্কার করলেন অথবা কার পিঠ চাপড়ে দিলেন সে খবর ফলাও করে প্রচার করাটাই এখন সাংবাদিকতা। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন ডজন ডজন উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন। সে সব প্রকল্পের ভবিষ্যত কী কেউ জানে না। সরকারের ভাঁড়ারে প্রকল্পের জন্য টাকা নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন, বাম জমানার দু’ লক্ষ হাজার কোটি টাকার দেনার কিস্তি মেটাতেই রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী অম্লান বদনে পাঁচ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়ের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। চ্যানেলগুলিতে প্রতিদিন নানা বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক সভা হয়। কোথাও কোনওদিন আলোচনা হয় না যে মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি দেবেন! পরিবর্তনের সরকারের এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে একটিও শিল্প কারখানা হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে শিল্পসংস্থার ভেকধারী কয়েকটি ‘চিটফান্ড’, গরিব মানুষকে ঠকিয়ে রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠেছে। কলকাতার ৯০ শতাংশ বাংলা চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের মালিক এখন এইসব ভুঁইফোড় চিটফান্ডের মালিকরা।

পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ইতিহাসে চিটফান্ডের পরিচালকরা সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলের সংবাদ প্রচারকে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। ঠিক এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের স্তাবকতা করাটাই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের একমাত্র কাজ হয়েছে। বাংলার সংবাদমাধ্যম সাধারণভাবে মানুষের চাহিদা, কষ্ট নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়।

গূঢ়পুরুষের কলম

সত্তরের দশকে দেখেছি জরুরি অবস্থা চলাকালে যথেষ্ট প্রলোভন দেখালেও বাংলার সাংবাদিকরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদলেহন করেননি। তাঁরা মাথা উঁচু করে প্রেস সেনসারশিপের অত্যাচার মোকাবিলা করেছেন। চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর স্তাবকতা করে সাংসদ, মিডিয়া ম্যানেজার, বিধায়ক হতে পারতেন। কেউ হননি। বরং আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে জেলে গেছেন।

সাংবাদিকদের একাংশ এর ফয়দা লুঠছে। এইসব স্তাবক সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী নানা সরকারি ও আধা সরকারি কমিটি গড়ে সদস্য করে দিয়েছেন। মোটা টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এইসব অর্ধশিক্ষিত অর্বাচীন দালাল সাংবাদিকরা কলম ফেলে ছড়ি হাতে এখন মহাকরণে ঘুরছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বেশ কয়েকজনকে ‘সাংসদ’ করে দিয়েছেন। একটি বাংলা চ্যানেলের জনৈক উঠতি সাংবাদিক এখন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া ম্যানেজার। রাজ্য সরকার মোটা টাকা বেতন দেয়। আবার চ্যানেলও বেতন দেয়। কিন্তু এই বেআইনি ব্যাপার নিয়ে কোনও কথা বলা যাবে না। বললে, রাতারাতি সিপিএম দলের এজেন্ট হয়ে যেতে হবে। তবে আশার কথা এই যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংবাদিক এমন অন্ধকার সময়েও নিজেদের বিক্রি করেননি। তাঁরা নির্লজ্জের মতো মুখ্যমন্ত্রীর বডিগার্ড হয়ে টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান না। দুঃখের কথা, আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন এই সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ প্রতিবেদন চিটফান্ডের কাগজ ছাপে না। দালালদের দাপটে তাঁরা পিছনের সারিতে দাঁড়ান। সত্যি, বাংলার সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতার নামে এখন ‘দালালরাজ’ চলছে।

স্তাবকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার নমুনা রাজ্যবাসী ভারত বন্‌ধের দিন প্রত্যক্ষ করেছেন। টিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে শুনশান চৌরঙ্গী এলাকা। অথচ বলা হয়েছে জনজীবন স্বাভাবিক। জেলায় জেলায় দেখা গেছে দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। বলা হয়েছে বন্‌ধে সাড়া নেই। কলকাতায় দুটি বাসে ভাঙচুর হয়েছে। সেই দৃশ্য সারাদিন ধরে হাজারবার টিভির পর্দায় দেখানো হয়েছে খোলাখুলিভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপি সমর্থকরাই বাসে আগুন দিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ করা হয়নি। এবং পুলিশ ও প্রশাসন বলেছে বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ ছিল। তাতে কী হয়েছে! স্তাবকরা বলেছে, বিজেপি এবং সিপিএম যুক্তভাবে হাঙ্গামা করেছে। স্তাবকদের কথা সবাইকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে।

সত্তরের দশকে দেখেছি জরুরি অবস্থা চলাকালে যথেষ্ট প্রলোভন দেখালেও বাংলার সাংবাদিকরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদলেহন করেননি। তাঁরা মাথা উঁচু করে প্রেস সেনসারশিপের অত্যাচার মোকাবিলা করেছেন। চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর স্তাবকতা করে সাংসদ, মিডিয়া ম্যানেজার, বিধায়ক হতে পারতেন। কেউ হননি। বরং আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে জেলে গেছেন। নিজেদের বিক্রি করেননি। মানুষের বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধাই ছিল তাঁদের পেশার মূলধন। পরিবর্তনের ধাক্কায় বাংলার সাংবাদিকতার আদর্শ ঐতিহ্য আজ ভূলুণ্ঠিত। প্রতিবাদের সাহস সাংবাদিকরা হারিয়েছেন।

রাজ্য রাজনীতি

শাহরুখকে নিয়ে মাতামাতি রাজ্যবাসী ভাল চোখে নেননি

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নানান দৃশ্য ও কুশীলব--- অবশ্যই রাজ্যের জনগণ আর পরিচালকের ভূমিকায় রাজনীতিকগণ।

পাঠকদের সামনে একটি একটি করে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে— এতে রাজনীতিকদের চেহারা স্পষ্ট করে দেখতে পারবেন এবং শেষ পর্যন্ত জনগণই চূড়ান্ত রায় দেবেন। প্রথম দৃশ্য বলিউড নায়ক শাহরুখ খানের ক্যালকাটা নাইট রাইডার্স-এর আই পি এল জয়। শাহরুখ খানকে মমতাদেবী রাজ্যের 'ব্র্যান্ড-অ্যাম্বাসাডর' করেছেন। কোটি কোটি টাকা খানসাহেবের হাতে দিয়ে রাজ্য-সরকারের বিপুল কর্মকাণ্ডের ঢক্কা-নিনাদ করবেন। এহেন শাহরুখ খানকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হলো— কারণ তিনি আই পি এল জয়ী। আই পি এল একটি ব্যবসায়িক ক্রীড়া কর্মসূচী। এই সংবর্ধনায় অবশ্যই লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল শাহরুখ খানকে দেখার জন্য। শাহরুখ খানকে সোনার চেন লকেট পরানো হলো। অথচ এ-রাজ্যের খেলোয়াড় লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে পাদপ্রদীপের সামনে আনা হলো না। খেলোয়াড়েরা থাকলেন অবন্দিত, সমস্ত বন্দনা হলো শাহরুখ খান-এর। এখন এই রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর-এর সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে এসে গেল--- ইনি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে প্রাণমন ঢেলে দেন। কারণ তাঁর হাতে একটি ছবিতে অভিনয় করার প্রস্তাব ছাড়া কিছুই নেই। পেপসি কোম্পানি খানসাহেবকে বিদায় দিয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন (?) ছোটা শাকিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য হিন্দি ছবির প্রযোজক ভরত শাহ-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ভরতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শাহরুখকেও আদালতে হেয় করা হয়।

সম্প্রতি রাজস্থানের জয়পুরে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম-এ ধূমপান কাণ্ডে শাহরুখের বিরুদ্ধে মামলার পরও পুলিশ তাঁকে অব্যাহতি দেয়। ঠিক বছর খানেক আগে টু-জি-স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গিয়েছিল খানসাহেবের নাম। কারণ টু-জি স্পেকট্রামের জুয়াড়ি খানসাহেব-এর ছবিতে টাকা দিয়ে থাকেন। এহেন কে কে আর-এর মালিক শাহরুখ খানের জয়ে 'গর্বিত' হয়েছেন মমতা এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। ধন্য কলকাতার মানুষ যাঁরা শাহরুখ-কে দেখার জন্য আকুল! এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শাহরুখ-জুহি চাওলাদের সঙ্গে নৃত্য করলেন রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রী। ধন্য হলো রাজ্যবাসী। সংবর্ধনার

যিনি বিরোধী নেত্রী হিসাবে নিজের দলকে নিয়ে ট্রাম-বাস-পুড়িয়ে রাস্তা কেটে সরকারি অফিস তছনছ করে বিডিওকে চড় মেরে বিধানসভায় তাণ্ডব করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তিনিই কোন নৈতিকতায় পাইকারি জরিমানার হুমকি দিচ্ছেন? যে কোনও বন্‌ধ উপলক্ষ করে অথবা বিক্ষোভ দেখানোর নামে জ্বালানো- ভাঙচুর ইত্যাদি হিংসাত্মক ঘটনা নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে সিপিএম পথিকৃৎ আর তৃণমূল তার অনুসারী।

সোনার হারের মূল্য ও অন্যান্য খরচ জোগালো কলকাতা পুরসভা। যদিও পুরসভাকে কর বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ দেয়নি।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় দৃশ্য--- পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৩১ মে সারা ভারতবর্ষে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভারত বন্‌ধকে জড়িয়ে প্রকাশ পেল। এ-রাজ্যে বিজেপি-র সাংগঠনিক শক্তিকে অনেকেই তুচ্ছ করে থাকেন। কিন্তু ৩১ মে রাজ্যের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ যেমন দেখা গেলো, তেমনি দেখা গেল পুলিশের ব্যাপক তৎপরতা। সরকার তৃণমূল দল-কংগ্রেস বললো— সচল রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী এর পরেই ঘোষণা করলেন, "ট্রাম-বাস-সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলে জরিমানা হবে।" বৃটিশ আমলে পাইকারি জরিমানা করা হোত। এসব শুনে সেই প্রবাদ বাক্যটির কথা মনে পড়ে— 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!' যিনি বিরোধী নেত্রী হিসাবে নিজের দলকে নিয়ে ট্রাম-বাস-পুড়িয়ে রাস্তা কেটে সরকারি অফিস তছনছ করে বিডিওকে চড় মেরে বিধানসভায় তাণ্ডব করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তিনিই কোন নৈতিকতায় পাইকারি জরিমানার হুমকি দিচ্ছেন? যে কোনও বন্‌ধ উপলক্ষ করে অথবা বিক্ষোভ দেখানোর নামে জ্বালানো-ভাঙচুর ইত্যাদি হিংসাত্মক ঘটনা নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে সিপিএম পথিকৃৎ আর তৃণমূল তার অনুসারী। এসব কথা বলে, সরকারি কর্মচারিদের দণ্ডের ভয় দেখিয়ে শাসন করার নীতি প্রবর্তন করলেও বিক্ষোভকে দমানো যায়নি— যাবেও না। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত কনফেডারেশন অফ স্টেট গর্ভমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর মলয় মুখার্জি বলেছেন— "ধর্মঘট নিয়ে রাজ্য-সরকার যে-সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে তিন মাস অন্তর সভা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন— তা করতে কি সাহস পাচ্ছেন না?"

বর্তমানে মহাকরণে কান পাতলেই মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের বিরুদ্ধে নানা কথা শোনা যাচ্ছে! শোনা যাচ্ছে, সমরবাবু (চিফ সেক্রেটারি সমর ঘোষ)-র কলকাঠিতেই সব নিয়ম-নীতি চলছে। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়- কে কলকাতা পুরসভা থেকে সরিয়ে শিল্প সচিব করা হয়েছে। আগের শিল্প সচিব কোথায় গেলেন? মমতা ইউপিএ না-ছাড়া সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'তৃণমূল ইউপিএ ছাড়লে ইউপিএ সরকার পড়ে যাবে। তার ফলে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবে। তাই ইউপিএ ছাড়বেন না। সত্যিই যুক্তি বটে!

ডান্স বাংলা ডান্স : এটাই এখন রাজ্যের 'থিম সঙ্'

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরপর প্রতি সপ্তাহে আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে জানি অনেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। তবু আপনাকেই লিখব। বেশ করব লিখব। কারণ, আপনার মতো এত কালারফুল ব্যক্তিত্ব এই ভূ-ভারতে আর আছেটা কে? নাচে, গানে, উৎসবে আপনি যেভাবে মাতিয়ে রেখেছেন এমনটা কে কবে পেরেছে? কার মাথায় আসে যে এত কিছু করা যায়?

ক'দিন আগে বিলেতের এক ম্যাগাজিন আপনাকে বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাশালী মহিলার তালিকায় রেখেছে। তাতে অনেকের গা জ্বলেছে। আমি তো বলব, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনাকে বিনোদন দুনিয়ার সেরা পুরস্কারও দেওয়া উচিত। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তো বটেই, একজন শিল্পী হিসেবেও আপনার প্রাপ্য মর্যাদা এই পোড়া দেশ দিতে পারেনি আজও। আসলে আপনাকে যারা হিংসা করে তারা গোমুখ্যু। গুরুত্বটাই ঠাওর করতে পারে না। তবে বাঙালির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কোনও বিলিতি প্রাইজ এলেই অমনি তাঁকে নিয়ে সব্বাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিলেতের ম্যাগাজিনের পর মার্কিন হিলারিও আপনাকে কেমন ভালবেসে গেল। আমি তো বলি, ওরে, দুর্মুখের দল তোরা হিংসা না করে নিজেদের ঘরের মেয়েটাকে চিনতে শেখ।

দিদি, আপনার পারমিশন নিয়ে আমিই বরং আপনার গুরুত্বটা বোঝানোর চেষ্টা করি। ফি বছর আই পি এল খেলা হয়। প্রতিবারই কোনও না কোনও দল জেতে। কিন্তু কারও মাথায় এতদিন এসেছিল যে সেটাকে নিয়ে এত মাতামাতি, নাচানাচি করা যায়? এবার আপনি করলেন। দেখবেন আগামীবার থেকে সবাই এটা করবে!

আমি জানতাম দিদি, আপনি পারবেন। ওরা সব বলছে কলকাতা নাইট রাইডার্স একটা মুনাফা লোভি কর্পোরেট সংস্থা। তাদের দল তৈরি হওয়ার সময় কলকাতা-টলকাতা মাথায় থাকে না। ওটা হয় নিলাম করে। কার কত পয়সার জোর তার ওপর নির্ভর করে দল কতটা শক্তিধর হবে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। সব টাকা জুড়লে এরাজ্যের ঋণও শোধ হয়ে যেতে পারে। সে যাই হোক, দলটা জিতেছে। সে দলে ক'জন বাঙালি আছে সে প্রশ্ন এই ভুবনগ্রামের দুনিয়ায় না তোলাই ভাল। বিদেশি জাক কালিস না কী যেন নাম ওই লোকটাই দলকে জেতার মতো জায়গায় নিয়ে গেল। কিন্তু সেটাকে নিজেদের করে নিতে দোষ কোথায়? তাই তো বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মদন মিত্র মহাশয় বললেন, এই জয় 'মা-মাটি-মানুষের' জয়। এই জয় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।

সঙ্গে সঙ্গে একদল নিন্দুক রে রে করে উঠল। ব্যাটা বলে কী? ভাবটা এমনই ছিল। আমি বলি, দিদির আশীর্বাদ ছাড়া, বাংলার মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ ছাড়া ওই সিংহের দেশের কালিস এমন ব্যাট হাঁকাতে পারত নাকি?

যারা নাক কুঁচকেছিল তারাই কিন্তু টিভির দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়েছিল উৎসবের দিনটায়। সত্যি দিদি, ওই সিনটা ভুলতে পারব না। আপনি হাততালি দিয়ে শাহরুখ খানকে নাচাচ্ছেন। জুহি চাওলাকে নাচাচ্ছেন। রাজ্যপালকে নাচাচ্ছেন। সত্যি দিদি আপনাকে কুর্নিশ করতেই হয়। ফিল্মি ভাষায় বলতে হয়, দিদি তুসি গ্রেট হো।

শুধু কি ওই দিনটা? দিদি, আপনি ক্ষমতায় আসর পর থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন যাতে ওই সব পার্থিব যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে মানুষ। একের পর এক অনুষ্ঠান, মেলা, উৎসব করেছেন আর বাঙালি ভুলে গেছে বাঙ্গুর কলেজের অসভ্যতা, পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ, কার্টুন এঁকে অধ্যাপকের গ্রেফতার হওয়া, কৃষকের আত্মহত্যা, বিধান শিশু হাসপাতালে পাইকারি হারে শিশুমৃত্যু, চা বাগানের অনাহার কিংবা পাহাড় জঙ্গলের অশান্তি। সব চাপা পড়ে গেছে। স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। এমনকি সিঙ্গুরের মানুষেরাও ভুলে গেছে যে ৪০০ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ফাইনাল প্রতিশ্রুতিও এক বছর পার করেছে। খুব ভাল স্ট্র্যাটেজি দিদি। চালিয়ে যান।

গত এক বছরের রাজত্বে দিদি আপনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মোট ২৯টি জন্মদিন পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত থেকে ইন্দিরা, রাজীব গান্ধী, সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক কেউ বাদ নেই। এছাড়া ভাষা দিবস থেকে মে দিবস-খান দশেক দিবস পালন করেছেন। নাটক থেকে যাত্রা, রবীন্দ্র, নজরুল, প্রগতি খান-পনেরো মেলা হয়েছে এক বছরে। বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গসম্মান ছাড়াও সঙ্গীত মেলায় নানা নামের পুরস্কার মিলিয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশজনকে সম্মানিত করেছেন। এছাড়াও সরকারি উদ্বোধন আছে গোটা চল্লিশ। ৭৯৩টা ক্লাবকে দু'লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। শাহরুখ খান, শর্মিলা ঠাকুরদের নিয়ে এসে রাজকীয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করেছেন। চালু করেছেন চিল্ড্রেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। দিঘায় বিচ ফেস্টিভ্যাল। এছাড়া কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বই প্রকাশ, প্রচার সেসব তো আছেই। এর পরও আপনার মাথায় আছে বিশ্ব যুব সম্মেলন। তার দিনক্ষণ পাকা হওয়াই যা বাকি। বিশ্বনাথন আনন্দকে সংবর্ধনা। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসার পরীক্ষায় কৃতিদের নিয়ে সমাবেশ।

এসবের পরও যারা বলে আপনি কাজ করেননি তাদের পাত্তা দেবেন না দিদি। আপনি চালিয়ে যায়। এবার জন্মদিন পালনের তালিকাটা আরও কিছুটা লম্বা হবে এই আশা নিয়েই চিঠি শেষ করছি।

— সুন্দর মৌলিক

পুনশ্চ : সামনেই ৬ জুলাই। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। যদিও তাঁর জন্যই আপনার সাধের বাংলাটা আছে, তবু দিদি কোনওভাবেই সেটা পালন করবেন না। গায়ে সাম্প্রদায়িকের স্ট্যাম্প পড়ে যাবে। পরামর্শটা মাথায় রাখবেন।

লোকপাল বিল-কে ঠেকিয়ে রাখতে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হলো

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তাহ দু'য়েক আগে বহু বিতর্কিত লোকপাল বিলটিকে কেমন অবলীলায় সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আগামী তিন মাসের মধ্যে লোকসভার অধিবেশনের সম্ভাবনা নেই। অনেকটাই নিশ্চিন্তি ক্রয় করা গেছে। মনে রাখতে হবে সরকারের কাছে এই আদ্যন্ত অস্বস্তিকর বিলটি বিগত লোকসভার একেবারে সমাপ্তি লগ্নে উপরাষ্ট্রপতি শ্রী হামিদ আনসারি উত্থাপনের অনুমতি দিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো নিমিত্ত মাত্র, অন্তরালবর্তী কুশীলবদের প্ররোচনাতেই তিনি এমনটা করেছিলেন, তাও সহজবোধ্য। উদ্দেশ্য একটাই— উপযুক্ত সংশোধনী, বিতর্ক, সংযোজন- বিয়োজন ছাড়াই বিলটি যেমন আছে তেমন অবস্থাতেই তড়িঘড়ি পার করিয়ে দেওয়া।

কংগ্রেস ও সি বি আই :

কংগ্রেস সরকারের প্রস্তাবিত লোকপাল বিলে যে কোনও আগ্রহ নেই সেটি আবার পরিষ্কার হলো লালু, মুলায়ম, মায়াবতীর স্বাভাবিক আপত্তি- ওজরকে সম্বল করেই সরকার যখন এটিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাল। বিলটির নানাবিধ ধারা-উপধারার আলোচনা ব্যতিরেকেই একটা বিষয় যে সরকারের গলায় কাঁটার মতো বিঁধছে--- সেটা সি বি আই-এর অধিকার। পুরোপুরি লোকপালের অধীনে রেখে সি বি আই-কে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে প্রস্তাবিত বিলটি নখদন্তহীন হয়ে পড়বে একথা সরকারের চেয়ে কেউ ভাল জানে না। অতীতের অসংখ্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ আচরণের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল ২৭ মার্চের ঘটনা। অন্ধ্রপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত রাজশেখর রেড্ডীর পুত্র জগমোহন রেড্ডী ক্ষমতার দড়ি টানাটানিতে কয়েক বছর ধরেই তাঁর পিতার দলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে নানান পারিবারিক সমীকরণও জড়িয়ে যায়। চরমপন্থা নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে নিজের দল গঠন করে সাংসদও হয়ে গেছেন। নিজের দিকে বহু বিধায়ককে টেনে এনে অন্ধ্রে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টিও করেছিলেন। বাবার মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসার অধিকার যে তাঁর জন্মগত এমনটা ভাবা তো তাঁর অপরাধ নয়। জীবিতাবস্থায় ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে প্রয়াত রাজশেখর অন্ধ্র থেকে কংগ্রেসকে সর্বাপেক্ষা বেশি সাংসদ উপহার দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন কংগ্রেস অন্তরাত্মার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাঁর এই সাফল্য যে কংগ্রেসকে কেন্দ্রে সরকার গড়তে অনেকটাই সাহায্য করেছিল একথাও সত্যি। তাঁরই পুত্র তো বরাবর দেখে এসেছেন বাবার পূজনীয় নেত্রীর পরিবারের স্বজন-পোষণের সংস্কৃতি বা উত্তরাধিকারের কংগ্রেসীদের মান্য ধারা। সেটিই তিনি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছেন। বছরখানেক সুলুক সন্ধান করার পর কংগ্রেস সরকার তাদের ব্রহ্মাস্ত্র সি বি আই-কে জগনের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। ১৪ দিনের সি বি আই হেপাজত। এই ইচ্ছামূলক বা অভিসন্ধিমূলক গ্রেপ্তার করার অধিকারটি হাতছাড়া হয়ে যাবার আতঙ্কই যে লোকপাল বিলের বাস্তবায়নের মূল বাধা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আজকে সি বি আই বলছে জগনের বিরুদ্ধে ৩৫৬ কোটি টাকা হিসাববহির্ভূত সম্পত্তির তদন্তের ফলশ্রুতিতেই এই গ্রেপ্তার। খনি, লোহা, কারখানা থেকে শুরু করে নানান লাভজনক ব্যবসায় যেখানে জগনের স্বার্থ জড়িত সেখানেই নাকি তৎকালীন অন্ধ্র সরকার দান খয়রাতির মতো টাকা ঢেলেছে। এই একই কংগ্রেস দল কি তখন জানত না সেখানে কি হচ্ছে? বি জে পি মুখপাত্র সি বি আইকে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহারের কথাই সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই ঘুরপাক খাচ্ছে লোকপাল বিলের ভবিষ্যৎ।

> বিলটির নানাবিধ ধারা-উপধারার আলোচনা ব্যতিরেকেই একটা বিষয় যে সরকারের গলায় কাঁটার মতো বিঁধছে--- সেটা সি বি আই-এর অধিকার। পুরোপুরি লোকপালের অধীনে রেখে সি বি আই-কে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে প্রস্তাবিত বিলটি নখদন্তহীন হয়ে পড়বে একথা সরকারের চেয়ে কেউ ভাল জানে না।

ধামাচাপা বিলে কি আছে :

সরকারের প্রস্তাবিত বিলটিতে লোকপাল সি বি আই-এর তৈরি চার্জশীটকে ভেটো দিতে-নয়, ভেট (অর্থে পরীক্ষা করে) সাধারণভাবে অনুমতি দেবার জায়গায় থাকবে। তার কাজ মূলত তত্ত্বাবধায়কের--- কর্তৃত্বমূলক নয়। সি বি আইও

বরাবরের মতো তার কাজকর্মের জন্য সরকারকেই জবাবদিহি করবে। সরকারই সি বি আই ডাইরেক্টর পদে বসার যোগ্য প্রার্থী মনোনীত করবে। সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার পর এখন তাদেরও ভাবতে হবে লোকপাল কাদের নিয়ে গঠিত হবে। এই সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মধ্যে সরকারের নিযুক্ত লোকজনেরই পাল্লাভারী অর্থাৎ সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। তিন মাসের মধ্যেই সিলেক্ট কমিটিকে এই অব্যবস্থা দূর করতে হবে। নিজেদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন অনেক সাংসদকেই বলতে শোনা যাচ্ছে— 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' অর্থাৎ নিদেনপক্ষে একটি দুর্বল লোকপাল হলেও ল্যাঠা চুকে যাবে। এই অভিযোগটিও অসত্য। এই সরকার লোকপাল বিলটির উত্থাপন নিয়ে নানা রকমের ফন্দিফিকির করে এটিকে দেরি করিয়েছে। কারণ যতক্ষণ ঠেকানো যায়। এখনকার লোকসভার ১৬২ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা ঝুলে রয়েছে। বিভিন্ন দল মিলিয়ে ৭৫ জনের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গঠিত ফৌজদারী অভিযোগ রয়েছে। হ্যাঁ, এগুলির কোনওটা থেকেই রাজনীতিকদের সহজে পালাবার পথ নেই অর্থাৎ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' নয়। একটি সত্যিকারের স্বাধীন, শক্তিমান লোকপাল আইনানুগ তত্ত্বাবধান স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারলে এদের অনেকেই জেলে ঢুকবে। মুশকিলে পড়বে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলও যারা নিয়ম করে এই সমস্ত দাগীদের টিকিট দিয়ে যাচ্ছে।

পঙ্গু সি বি আই :

এই হাত-পা বাঁধা সি বি আই-এর দুর্দশা বোঝাতে বেশি দূর না গিয়ে লালুর কথায় আসা যাক। ১৯৯৬ সালের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে জড়িত লালুর বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে চার্জশীট দাখিল করলেও ২০০৪-এ ইউ পি এ-১ ক্ষমতায় আসার পরেই সেটি ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে যায়। ঢোকানো হয়। অবশেষে ২০১২ সালে সি বি আই নির্দিষ্ট চার্জ গঠন করেছে। ভাবুন, একদিকে ৯ বছরের শাস্তি আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক বিরোধীদের ক্ষেত্রে, তখন সি বি আই-কে ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছোটানো হয়। পুলিশ তখন বাঘের বাচ্চা। নির্বাচিত তথাকথিত নেতারা যখন নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ান তখনই আইনকে ধর্ষিত হতে হয়। ক্ষমতার খেয়ালখুশি মতো প্রয়োগ ও কুশাসনই এই সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

আমাদের দেশে সমস্ত রাজনৈতিক দলই সর্বদা একটা সর্বশক্তিমান মনে করার আবহাওয়ায় কাটায়। যা ইচ্ছে তাই করার অবাধ স্বাধীনতা। হ্যাঁ, মুশকিল একটু আছে তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। আজকাল নির্বাচন কমিশনের দৌলতে নির্বাচনের কিছু আগে বা পরে কমিশনের নজরদারীতে তাদের তুঘলকী কাণ্ডকারখানায় একটু ছেদ পড়ে। বাকি সময় তারা খুল্লাম-খুল্লা।

দলগুলির সারা বছরের দুর্নীতি :

(১) জনতার মত, ভাবনাকে থোড়াই কেয়ার করে তারা নানান অপরাধে জড়িত থাকা প্রার্থীদের নির্বাচনের টিকিট বিলি করে।

(২) ক্ষমতায় এলে অবৈধভাবে পুষিয়ে দেওয়ার অলিখিত প্রতিশ্রুতিতে ছোট-বড় সব রকমের ব্যবসাদারদের কাছ থেকে তাদের হিসাববহির্ভূত টাকাকড়ি আদায় করে।

(৩) এইভাবে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন চুক্তি ও প্রকল্পের ভার নিজের পছন্দের লোকদের দিয়ে আরও টাকা কামায়, আবার তা দিয়েই ভবিষ্যতে ভোট কেনে। যেমন আমরা দেখছি খনি, জমি, স্পেকট্রাম, কয়লা সংক্রান্ত আগণ্ডা কেলেঙ্কারী। সবই ইচ্ছেমতো টাকার বিনিময়ে বিলিয়ে দেওয়া।

(৪) জায়গায় জায়গায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ বেছে বেছে তারা ধান্দা করে। অনেক সময় কুৎসার মাধ্যমে জাতপাত নিয়ে চরম নোংরা খেলা খেলে। আমাদের নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে সরকারের কাছে আবেদন করে আসছে যাতে সমস্ত নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলই তাদের পরীক্ষা ও হিসেব-নিকেশ একটি ত্রৈমাসিক সময়সীমা পেরনোর ৬০ দিনের মধ্যে তাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়। নইলে রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের স্বীকৃতি বাতিল করার ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হোক। পাগল! সরকার কানই দেয়নি। সংবিধানবিহিত সংস্থা হলেও নির্বাচন কমিশনের হাত পা বাঁধা, একটা অবস্থার পর তারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের নিজের গাড়ী ভাড়ার টাকাটাও যে আইন মন্ত্রকের তাঁবেদারীতেই ছাড়পত্র পায়!

তবু নির্বাচন কমিশন বাঁচুক :

আগে বলা অপরাধীকরণ আটকানো, ত্রৈমাসিক হিসেব নিকেশ, অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলেও দেশের নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করে তোলার যে নিরন্তর প্রক্রিয়া কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে সেটি দেশের রাজনীতির শুদ্ধিকরণে ব্যাপক ভূমিকা নিচ্ছে। এটির প্রচার তুলনামূলকভাবে কম।

নির্বাচন কমিশন তাদের কার্যক্রমের অন্তর্গত যে বিষয়গুলিতে সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছে— (১) ভোটাররা কীভাবে টাকা ও বাহুবলীদের ঠেকাবে।

(২) জাতপাতের ভিত্তিতে দলবেঁধে ভোট দেওয়ার প্রবণতা আটকানো।

(৩) নিজেদের সাংসদদের কাছে উপর্যুপরি দাবী জানানো যাতে তারা বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিনে 'কোন প্রার্থীকেই চাই না' এই বিকল্পটি রাখার ব্যবস্থা করেন।

সরকার কান না দিলেও নির্বাচন কমিশন নিজেই ইতিমধ্যে একজন আই আর এস অফিসারের অধীনে একটি নিজস্ব অডিট বিভাগ খুলেছে যারা সারা বছর রাজনৈতিক দলগুলির হিসেব-নিকেশ, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার ওপর নজর রাখছে। ২০১২, ২০১৩ বিধানসভা ও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের সময় এই বিভাগকে আরও কড়া ভূমিকায় দেখা যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতি :

আলোচিত বিষয়গুলি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, জাতপাত, জোর করে টাকা আদায়, টাকার হিসেব না দেওয়া ইত্যাকার জিনিস চালিয়ে যাওয়া আমাদের রাজনীতিকদের প্রিয় বিষয়। তাঁরা প্রাণ থাকতে এই অবস্থার পরিবর্তন চান না। ভাবলে অবাক হতে হয়, ভারতের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক দেশের ভার যাদের হাতে তাঁরাই এটিকে নিজ স্বার্থে কলঙ্কিত করতে বদ্ধপরিকর। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আগামী লোকসভা অধিবেশনে একটি নখদন্তময় লোকপাল বিল অনুমোদন না করাতে পারলে সংসদ গণবিক্ষোভের মুখে পড়বে। সংসদের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিকে যত তাড়তাড়ি সম্ভব একাধারে বিরোধীপক্ষ অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজের তোলা অভিযোগগুলির ভিত্তিতে একটি যথার্থ লোকপাল বিল পেশ করতেই হবে। হ্যাঁ, অনেক দেরি হয়ে গেছে, দেশের আইন প্রণেতাদের দেশবাসীর কাছে দায়বদ্ধ থাকতেই হবে!

সূত্র : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

আর টি ই এবং সংখ্যালঘুদের উদাসীনতা

রামমাধব

দেশের সমস্ত শিশুর শিক্ষায় মৌলিক অধিকার থাকার প্রস্তাবটি ২০০২ সালে এন ডি এ আমলে আনা হলেও পরবর্তী সরকারের টালবাহানায় দীর্ঘ ৫ বছর পর ২০০৯ সালে তা আর টি ই অর্থাৎ রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কমপালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯ নামে আইনে পরিণত হয়েছে। এই মর্মে সংবিধানের ২১নং ধারায় একটি ‘A’ উপধারা যোগ করে ২১-এ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশে এখন পর্যন্ত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে শিশুদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর বৈসাদৃশ্য বিরাজ করছে। বুনিয়াদী শিক্ষার শুরুতেই ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা পাবলিক স্কুল, আবাসিক বিদ্যালয়, কনভেন্ট প্রভৃতিতে শিক্ষালাভের যে পর্যাপ্ত প্রারম্ভিক সুযোগ পেয়ে এগিয়ে থাকে দরিদ্র ও কম আয়ের পরিবারগুলি তা থেকে বঞ্চিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকেজো সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা বা দাতব্য বিদ্যালয়গুলিই তাদের শেষ ঠাঁই হয়ে দাঁড়ায়।

কয়েক দশক ধরেই আমাদের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কোনও উন্নতিই নজরে পড়েনি। সত্যি কথা বলতে কি, বিপুল পরিমাণ আর্থিক অনুদান ও বক্তৃতার ঢক্কানিনাদ বয়ে গেলেও বিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থা অতি হতশ্রী। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রকরণের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটে গেলেও সরকারি স্কুলগুলিতে এখনও কম্পিউটার তো দূরস্থান পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ, ভাল শিক্ষক পাওয়ার স্বপ্নও পূরণ হয়নি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নিরক্ষরের দেশ

স্বাভাবিক পরিণতিতেই সদ্য সমাপ্ত ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী এখনও দেশের সাক্ষরতার হার ৭৩-৭৪ শতাংশেই ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিক দিয়ে হিসেব করলে ২৬ শতাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। এর অর্থ জনসংখ্যার ৩০ কোটি মানুষ সই করতে পারেন না। এই নিরিখে আমরা একটা নিকৃষ্ট রেকর্ড করে ফেলেছি। পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে বেশি নিরক্ষরের দেশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আর টি ই অ্যাক্ট একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই আইনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সব রকমের ব্যক্তিমালিকানার শিক্ষাদানের কেন্দ্রগুলিকেও (All Private Educational Institutions) বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকটি ভারতীয় শিশুকে সাক্ষর করে তোলার সামাজিক দায়ভার নিতে বাধ্য করা। এই ২১-এ আইনের ধারা অনুযায়ী সমস্ত পাবলিক ও প্রাইভেট স্কুল তা সে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত হোক বা নাই হোক, সকলকেই দরিদ্র ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতেই হবে। এই সুবাদে ৬ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকার পাবে।

আইনটির প্রায়োগিক দিক

এটা তো স্বাভাবিকই এমন একটি মহৎ প্রকল্পের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কিছু অসুবিধে, অস্বস্তি দেখা দেবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামারাও-এর মস্তিষ্কপ্রসূত একটি প্রকল্পের কথা বলা যেতে পারে। সেই সময় এন টি আর সব হোটেলগুলিকে কিছু কিছু খাবার একটি সরকার নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করার আদেশ জারি করেন। গরীব মানুষরাও যাতে বড় হোটেলের খাবার খেতে পারেন সেটিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ২টি করে ইডলির দাম ধার্য করা হয়েছিল ২ টাকা। আর ওজনও ছিল বেঁধে দেওয়া। ফাঁকি রোখার সব ব্যবস্থাই ছিল পাকা। প্রথমটায় সবাই বেশ মেতে উঠেছিল। কিন্তু এর পরেই হোটেল মালিকদের খেলা শুরু হলো। তারা হোটেলগুলিতে দু’ রকমের মেনু চালু করে দিল। একটি সরকার নির্ধারিত খাবারগুলির জন্য, বাকিটি অন্যসব খাবারের জন্য। বাস্তবে একই হোটেলের মধ্যে একটি শ্রেণী বিভাজনের জন্ম হলো।

এই উদাহরণটি মাথায় রাখলেই বোঝা যাবে

যে নতুন শিক্ষা প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক কিছু অসুবিধা দেখা দেবে। একই স্কুলে হতদরিদ্রের ছেলে বা মেয়েটি ধনীর দুলাল-দুলালীর সঙ্গে ঠিকভাবে মিশতে পারবে তো? এর ফলে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই হয়ত আমাদের দেশের শ্রেণী বৈষম্য একটানে মুছে যাবে! নাকি একেবারে আদুড় শৈশবে বিদ্যালয়কক্ষ থেকেই শ্রেণী বৈষম্যের বিষ রোপিত হবে? তবে কেউই কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না দেশের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে দেশের নামীদামী বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির কিন্তু দায়িত্ব আছে। তবু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল এই সংস্থাগুলি নানা কারণে তেড়েফুঁড়ে আর টি ই আইনের বিরোধিতা করে গেল। একেবারে সকলেই যে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে চলেছে তা না হলেও, সরকারের অনভিপ্রেত নাক গলানোর সম্ভাবনা এড়াতেই যে এই বিরোধিতা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

মহামান্য আদালতের রায়

সরকারি-বেসরকারি উভয় বিদ্যালয়গুলিতেই ২৫ শতাংশ গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক

সংরক্ষণ আইনটি এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই যাতে প্রচলিত হয় সর্বোচ্চ আদালত সে ব্যাপারে যত্নবান হতে বলেছে। এর মানে প্রতিটি রাজ্য সরকারকেই বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সংস্কারে ব্যস্ত থাকতে হবে যাতে আইনটি নির্দেশ মতো প্রয়োগ করা যায়।

কিন্তু শক্তিশালী ক্রিকেট দলে দু'-একটি অপটু ফিল্ডার থাকার মতো সর্বোচ্চ আদালতের রায় একটি বিষয়ে হতাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রকমের শিক্ষায়তনগুলিতেই এই সংরক্ষণ চাওয়ার কথা বললেও সর্বোচ্চ আদালত কিন্তু সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয়, এমন সংখ্যালঘুচালিত বিদ্যায়তনগুলিকে এই সংরক্ষণের আওতার বাইরে রেখেছে। এখানে বলা প্রয়োজন তিনজন মহামান্য বিচারপতিদের মধ্যে একজন সমস্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আর টি ই আইনের বাইরে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের কথা বিচারকদের গরিষ্ঠাংশ এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে বলেছেন, কেবলমাত্র সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয়, শুধুমাত্র এমন সংখ্যালঘু শিক্ষায়তনগুলিই শতকরা ২৫ ভাগ সংরক্ষণের আওতার বাইরে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে মহামান্য বিচারকদের রায় এমন কিছু সূক্ষ্ম টেকনিক্যাল বিষয়কে মাথায় রেখে দেওয়া হয়েছে যা ভবিষ্যতে অনায়াসেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তাঁদের মন্তব্য সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সংরক্ষণ প্রয়োগ করলে তাদের 'মূলগত চরিত্রই' পালটে যেতে পারে। কিন্তু এটা সব সময়ই আশা করতে হবে যে সর্বোচ্চ আদালতের মতো প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ছোটখাটো কৌশলগত দিক মাথায় না রেখে সর্বদা সংবিধানের মূল সুরটিকেই গুরুত্ব দেবে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই 'মূলগত চরিত্র' ব্যাপারটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। দেশের সর্বত্রই দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের মূলগত চরিত্র নির্ভর করে তার পরিচালকমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যের ওপর। এবার আইন মোতাবেক এই পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের গরিষ্ঠাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া আবশ্যিক। বিদ্যায়তনটির চরিত্র সেখানে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের উপর কখনই নির্ভর করে না। বাস্তবে গণ্ডায় গণ্ডায় সংখ্যালঘু পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা যাবে (মিশনারী বিদ্যালয়) যেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠাংশ। মহামান্য বিচারকরা এক্ষেত্রে সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নং ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য গুরুত্বের কথাই শুধু মাথায় রেখেছেন। আর টি ই আইন যেখানে শিশুদের শিক্ষালাভের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে যে কারণে সরকারি অনুদানহীন সংখ্যালঘু শিক্ষা সংস্থাগুলিকে আদালত অবশ্যই সংখ্যালঘুদের মধ্যে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ সংরক্ষণ রাখার নির্দেশ দিতে পারত। তাদেরকে (সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে) পুরোপুরি সামাজিক দায়-দায়িত্বের বাইরে রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাই এই নির্দেশ যথাযোগ্য জায়গায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

> **"আর টি ই আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে সংখ্যালঘুদের শিক্ষায়তনগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি চরম অনীহা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আর টি ই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তারা মরীয়া হয়ে বিরোধিতা করল আর অন্যান্য অনুদানপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু শিক্ষায়তনগুলি যেখানে সরকারি আইনটির আওতায় পড়ল তারা অবলীলায় এর বাইরে রয়ে গেল।"**

সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও চরিত্র

আর টি ই আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে সংখ্যালঘুদের শিক্ষায়তনগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি চরম অনীহা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আর টি ই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তারা মরীয়া হয়ে বিরোধিতা করল আর অন্যান্য অনুদানপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু শিক্ষায়তনগুলি যেখানে সরকারি আইনটির আওতায় পড়ল তারা অবলীলায় এর বাইরে রয়ে গেল। অথচ দেখুন একথা মূর্খেও জানে আমাদের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্যান্য বহু সময়েই দেখা গেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা এই একই সর্বোচ্চ আদালতের কাছে এস সি, এস টি সংরক্ষণের বা অন্যান্য সুবিধে আদায়ের ব্যাপারে তাদের সম্প্রদায়ের গরীবদের নামে কেঁদে ভাসিয়েছে। অথচ যখন তাদেরই সম্প্রদায়ের গরীবদের নিখরচায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারটা এল তখনই তারা নিজেদের গুটিয়ে নিল। এতেই পরিষ্কার হয় মুসলিমরা সংখ্যায় বিশ্বাস করে সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়নে নয়। ভারতীয় হিসেবে বিমর্ষতা গ্রাস করে যখন মনে হয় দেশের সর্বোচ্চ আদালতও বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের এমনভাবে এড়িয়ে গেল।

একথা আমরা সকলেই জানি আমাদের দেশের সব থেকে ব্যয়বহুল ও নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৃহৎ অংশই সংখ্যালঘু দ্বারা পরিচালিত। আমরা একথাও জানি এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠাংশের পরিবারের ছেলেমেয়েদেরই লেখাপড়া শেখায় যাদের বাপ-দাদার পাহাড় প্রমাণ পয়সা-কড়ি আছে। তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা এখানে গৌণ।

সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী তারা যেমন চালিয়ে যাচ্ছে চালিয়ে যাক, সংখ্যালঘুদের গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার অসংখ্যালঘু সরকারি স্কুলগুলিকেই বইতে হবে। কোনওরকম হেলাফেলা বা বাঁ হাতে মনসা পুজো করা যাবে না— পরম সমাদরেই তা করতে হবে, কেননা সেটিই ভারতীয় ঐতিহ্য।

তাই আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীব ছেলেমেয়েদেরই বুঝতে হবে যখন তাদের সত্যিকারের উন্নতির বা বিকাশের সুযোগ আসে তখন তাদের তথাকথিত পরিত্রাতারা ফিরেও তাকায় না— দূর দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর টি ই আইনের এটিই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

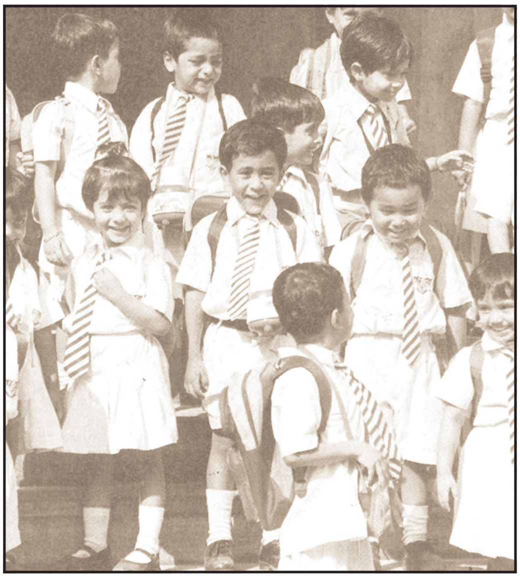

শিক্ষার অধিকার কিছু কথা

অনির্বাণ নিয়োগী

শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিলটির ইতিবাচক দিকগুলিকেই আমি একটু তুলে ধরব। পরে নেতিবাচক দিকগুলিকেও আলোচনায় আনব।

(১) প্রথম শুভ ইঙ্গিতটিই হলো পড়াশোনার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যতটা সম্ভব বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যম সর্বদাই মাতৃভাষা হোক এমনটা অভিপ্রেত হলেও সরকার বাস্তবে তা কতটা রূপায়ণ করতে পারবে? তার চেয়েও বড় কথা যে সব বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজিই শিক্ষার মাধ্যম, তাদের নিয়ে সরকারের চিন্তা-ভাবনা কি? বাস্তব পরিস্থিতি থেকে পরিস্কার শিক্ষার মাধ্যমের মাতৃভাষা হওয়াটা নিছকই খাতায় কলমে থাকবে।

(২) খুবই আশার কথা সরকারি বিল অনুযায়ী শিক্ষকদের ব্যক্তিগত শিক্ষকতা (Private Tuition) করা যাবে না। এটিও কাজে করে দেখানো খুবই শক্ত। অনেক সরকার এসেছে গেছে কিন্তু শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষকদের দেখা হয় একটা আস্ত ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে, তাই এদের আয়ের উৎসকে কেউই ঘাঁটাতে চাইবে না। (৩) কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ভর্তি হওয়া বন্ধ করার প্রস্তাবটি আরও একটি সুপ্রস্তাব।

তবে বিলটির সবথেকে আশাব্যঞ্জক দিকটি হলো একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম (National curriculum) তৈরি করার প্রস্তাব। এর ফলে সারা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে একটি সমান মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে। তৈরি হবে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ। প্রস্তাবিত বিলটিতে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতেও সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ রাখতে হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাইনে সরকার দিয়ে দেবে।

এবারে আমি বিলটির নেতিবাচক দিকগুলির দিকে নজর দেব। বহুল প্রচারিত যে 'মিড ডে মিল' নামক বস্তুটি আজ সারা দেশব্যাপী চলছে। আমার আপত্তি সেখানেই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ছাত্রদের একটা বড় অংশই এই 'মিড ডে মিল' খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নয়। তবু জোর জবরদস্তি তাদের এটা খেতে হয়। আর বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই রান্না-বান্নার বিষয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকেন তাদের পড়াবার সময়ে টান পড়ে।

বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী কোনও ছাত্র-ছাত্রীকেই ভর্তির সময় ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তা সে ঘোষিত ভর্তির তারিখ পেরিয়ে গেলেও নয়। এই প্রস্তাবটি বালখিল্যসুলভ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর পরেই আসছে কাউকে ফেল করানো হবে না-র কুপ্রস্তাব। এটিও একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত। বাস্তবে একজন পড়ুয়ার মনে যদি এই ভয়টা না থাকে; যে ভাল করে পড়াশোনা না করলে ফেল করে তাকে একই ক্লাসে তার চেয়ে ছোট ছোট পড়ুয়াদের সঙ্গে থাকতে হবে, তাহলে সে পড়ার আগ্রহ নিশ্চিতভাবে হারিয়ে ফেলবে। শুধু তাই নয়, অন্য পাঁচজন সহপাঠীকেও পড়াশোনায় নিরুৎসাহী করার চেষ্টা করবে।

মারধর করার মতো শাস্তি রোধ অনেকটা মেনে নেওয়া গেলেও পরিবর্তে কিছু না কিছু শাস্তির ব্যবস্থা রাখতেই হবে। অবশ্য কেউই জানে না সেই পরিবর্তিত শাস্তিগুলি কী। ফলে ছেলেপুলেরা শাস্তির খাঁড়া না থাকায় একবারে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বহু সংগঠনই ইতিমধ্যে সরকারের কাছে শাস্তি সম্পূর্ণ তুলে নেওয়ার প্রস্তাবটির পুর্নমূল্যায়ন করার আবেদন জানিয়েছে।

সবশেষে আমি আইনটির সব থেকে জঘন্য দিকটির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করব। আইনটিতে রয়েছে সমস্ত রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের কাছ থেকে একটি পরিচিতি বা শংসাপত্র যোগাড় করতে হবে। সকলেই জানেন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের পরিচিতি পত্র যোগাড় করতে গেলে রাজনৈতিক কূট-কচালিতে পারদর্শী হওয়া দরকার। অন্যভাবে বলতে গেলে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাসক দলের সু-নজরে থাকবে না তাদের পক্ষে পরিচিতি পত্র যোগাড় করা মহামুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পরিচালনাধীন বহু ছোট ছোট স্কুল চলে যেগুলির না আছে পর্যাপ্ত লোকবল না সেরকম টাকার জোর যা দিয়ে তারা পরিচিতিপত্র যোগাড় করবে। কিন্তু আইনে একটি ধারায় পরিস্কার বলা রয়েছে— কেবলমাত্র পরিচিতি পত্র থাকলে তবেই তারা নতুন স্কুল চালু করতে পারবে। এর ফলে ব্যাপারটা যেমন দাঁড়াচ্ছে তাতে কেবলমাত্র ভাল রেস্তওয়ালা লোকেরাই নতুন স্কুল খুলতে পারবে আর বলা বাহুল্য তারা সেগুলি খুলবে তাদের পছন্দের শহরগুলিতেই।

ওপরের বিষয়গুলি আলোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিলটি অবাস্তবতায় ভরা। এমন একটা সংবেদনশীল বিল বাস্তবে প্রয়োগ করার আগে আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে যাদের স্বার্থ ও ভবিষ্যত এর সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে তো বটেই। দেখে শুনে মনে হয় অদুর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়গুলিকে শুধু সাক্ষরতা কেন্দ্রে পরিণত করাই হয়ত বিলটির মূল উদ্দেশ্য।

(লেখক : বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সম্পাদক)

‘সবার জন্য শিক্ষা’ খাতায়-কলমেই বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে

বাসুদেব পাল

‘শিক্ষার অধিকার’ আইন (রাইট টু এডুকেশন) পাস হয়েছে। এরপর দু’বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত। কিন্তু প্রায় ৯৫ শতাংশ স্কুলে শিক্ষাদানের পরিকাঠামো এখনও অনুপস্থিত। দশ হাজার এন জি ও এবং তিনটি নেটওয়ার্ক এক সমীক্ষায় উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরেছে। আইন পাস করা আর বাস্তবে তা বলবৎ করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক থেকে যাচ্ছে।

ওই সমীক্ষা থেকে জানা গেছে— ৯৫.২ শতাংশ স্কুলে যে পরিকাঠামো থাকা উচিত— অন্তত পক্ষে ‘রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী, তা নেই। ২০০৯-’১০ বছরে মাত্র ৪.৮ শতাংশ স্কুলে সরকারি আইন অনুযায়ী যাবতীয় পরিকাঠামো আছে। এদিকে আর টি ই অনুসারে সবরকম আবহাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত প্রাথমিক পরিকাঠামো সব স্কুলে থাকা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য একটি শ্রেণীকক্ষ এবং প্রধানশিক্ষকের জন্য একটি আলাদা ঘর একান্তভাবে থাকা দরকার। ছাত্রদের জন্য একটি, ছাত্রীদের জন্য আলাদা একটি বাথরুম (টয়লেট), একটি খেলার মাঠ, একটি পাঠাগার— যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক বই-পত্র থাকবে, পুরো স্কুলবাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো-পাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা, কম্পিউটার এবং অন্যান্য বুনিয়াদী সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা ওই আইনে বলা আছে।

ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে— প্রতি দশটি স্কুলের একটিতে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। চল্লিশ শতাংশ স্কুলে ব্যবহারের মতো অবস্থা না থাকার কারণে একটি মাত্র টয়লেটেই কাজ চালাতে হচ্ছে। আরও চল্লিশ শতাংশ স্কুলে মেয়েদের আলাদা টয়লেটই নেই। ষাট শতাংশ স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই এবং প্রতি পাঁচটি স্কুলের মধ্যে মাত্র একটিতে কম্পিউটার আছে। আইনে প্রতি তিরিশ জন্য ছাত্রপিছু একটি ক্লাসরুম থাকার কথা বলা থাকলেও চল্লিশ শতাংশ স্কুলে শ্রেণীকক্ষ পিছু ছাত্রসংখ্যা তিরিশের বেশি।

রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক অম্বরীষ রাই জানিয়েছেন, ‘‘শতকরা ৯৫ ভাগ স্কুলেরই চিত্রটা হতাশাজনক, সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার জন্য আইনে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা বা পরিকাঠামো তৈরির সময়সীমার আর মাত্র এক বছর বাকি।’’ আইনে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শ্রী রাই আরও বলেছেন, সত্যিকার অর্থে ‘শিক্ষার অধিকার’ আইনকে বাস্তবায়িত করা এবং মৌলিক অধিকারে পরিণত করার জন্য রাজ্য সরকারগুলোর মনোভাব বা উৎসাহে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ফোরামের সদস্যরা আরও জানিয়েছেন যে, একাজে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে কমিশন গঠন এবং শিশুর অধিকার সুরক্ষা কমিশন (স্টেট কমিশন ফর প্রটেকশন অফ্ চাইল্ড রাইটস্ অথবা রাইট টু এডুকেশন প্রটেকশন অথরিটি)-এর নির্দেশক সিরিন ভাকিল মিলার এই অব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছেন।

অম্বরীষ রাই-এর আরও বক্তব্য, শীঘ্রই নির্ধারিত পরিকাঠামো উন্নত করা প্রয়োজন। কিন্তু এব্যাপারে অগ্রগতি

‘রাইট টু এডুকেশন’ আইনের একটি কার্যকরী দিক অবশ্যই ‘সর্ব শিক্ষা মিশন’। যা মনমোহন পূর্ববর্তী এন ডি এ সরকারের সময়ে গৃহীত হয়েছিল। কথা ছিল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও বালক-বালিকা স্কুলের বাইরে থাকবে না। পরবর্তীকালেও বাজেটে এজন্য ব্যাপক বরাদ্দ অনুমোদিত হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা হলো মাত্র ছয় শতাংশ বরাদ্দ প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

খুবই মন্থর। মাত্র চার শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় পায়ে চলা দূরত্বে। আর এখনও দেড়কোটির বেশি (১৫ মিলিয়ন) শিশু স্কুলের বাইরে।" উল্লিখিত রিপোর্টে ডাইস (ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন)-এর পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে একুশ শতাংশ শিক্ষকের কোনওরকম পেশাগত প্রশিক্ষণই ছিল না। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে এরকম শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৭০ হাজার জন।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে অনেক শিক্ষকদেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশ কম। এতে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের পঠন-পাঠনে প্রভাব পড়ছে। এটা তুলনামূলকভাবে ২০১০-এর থেকেও খারাপ। ২০১০ সালে ৯১ শতাংশ শিক্ষক সর্বভারতীয় শিক্ষক-যোগ্যতামান (National Teachers Eligibility Test যাকে সংক্ষেপে টেট বা TET বলা হয়) উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এবার তা ৯৩ শতাংশ। শ্রী রাই-এর মতে এটা হলো শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থাগুলোর বাস্তব চিত্র।

'রাইট টু এডুকেশন' আইনের একটি কার্যকরী দিক অবশ্যই 'সর্ব শিক্ষা মিশন'। যা মনমোহন পূর্ববর্তী এন ডি এ সরকারের সময়ে গৃহীত হয়েছিল। কথা ছিল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও বালক-বালিকা স্কুলের বাইরে থাকবে না। পরবর্তীকালেও বাজেটে এজন্য ব্যাপক বরাদ্দ অনুমোদিত হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা হলো মাত্র ছয় শতাংশ বরাদ্দ প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে— সংবাদসূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। বাদবাকি অর্থ স্কুলবাড়িসহ অন্যান্য পরিকাঠামোতে চলে যাচ্ছে। এদিকে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG) সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থ অডিট করার প্রয়োজন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

'একাউন্টেবিলিটি (Accountability) ইনিসিয়েটিভ' নামে বেসরকারি সংস্থা সমীক্ষার ভিত্তিতে তৈরি তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে— ৭৮ শতাংশ অর্থই শিক্ষকদের বেতন এবং ব্যবস্থার পিছনেই চলে যায়। ছাত্রদের কাছে পৌঁছোয় কেবলমাত্র ৬ শতাংশ। সাতটি রাজ্যের ১৪২৮৩টি স্কুলে সার্ভে করে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

অথচ প্রতি বছর বরাদ্দ বেড়ে চলেছে। ২০০৯ থেকে ২০১২-র মধ্যে বরাদ্দ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১০-এর এপ্রিল থেকে ২০১১ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ (৬৯ শতাংশ) অর্থই ওয়াটারশেড নির্মাণ, স্কুলের অনুষ্ঠান, ৮৯ রকম চার্ট, গ্লোব এবং রেজিস্টার কেনাতে খরচ হয়েছে। একাউন্টেবিলিটি ইনিসিয়েটিভ-এর নির্দেশক কামিনী আয়ার বলেছেন, ''শিক্ষকদের জন্য খরচের সঙ্গে ছাত্রদের বিষয়ে কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনি। যাতে করে ছাত্রদের মান উন্নীত করা যায়।"

সি এ জি পাঁচবছর আগে সর্বশিক্ষা অভিযানের খরচ-পত্র অডিট করেছিল। দেখা যাচ্ছে এই অভিযানে বছর অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ছিল এরকম— ২০০৯— ২৬,১৬৯ কোটি টাকা, ২০১০— ৪২,৯২৬ কোটি টাকা, এবং ২০১১— ৫৫,৭৪৬ কোটি টাকা।

কোন খাতে কত খরচ হয়েছে (শতাংশের হিসেবে)

সুযোগ-সুবিধাগত পরিকাঠামো—	২০১০	২০১১
প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়—	২৬%	২৬%
পানীয় জল—	১৭%	১৬%
রান্নাঘর—	১৮%	১৬%

২০০৯-১০ অর্থবছরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু বার্ষিক ২০০৪ টাকা বরাদ্দ ছিল। বর্তমানে ২০১১-১২ অর্থ বছরে তা বেড়ে ৪২৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সকল শিশু, বালক-বালিকা (১৪ বছর বয়স পর্যন্ত)-কে যে কোনও বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা— সেটাই বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

নেত্রদান মহাদান

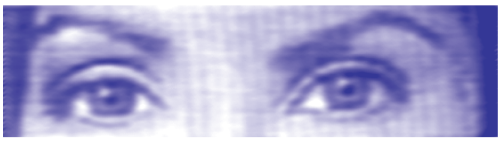

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান : 22181995, 22180387

সৌজন্যে : কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

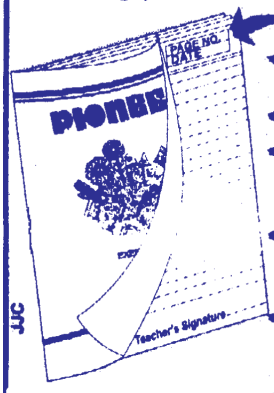

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

চিঠিপত্র

সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু

আজকাল সংবাদপত্র, টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেল কিংবা রেডিও খুললেই দেখা যায় কিংবা শোনা যায় শুধু একটা শব্দ— সংখ্যালঘু আর সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু মিনিস্ট্রি, সংখ্যালঘু কমিশন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড, সংখ্যালঘু ভবন, সংখ্যালঘু হোস্টেল, সংখ্যালঘু কলোনী, সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যালঘু মাদ্রাসা বোর্ড, সংখ্যালঘু ইন্টারভিউ বোর্ড, সংখ্যালঘু ইমামদের জন্য জনসাধারণের অর্থে ঢালাও প্যাকেজ, সংখ্যালঘু হজ হাউস ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আমি সবিনয়ে বলছি যে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগুরু বলে একটা সম্প্রদায় আছে এবং তাদেরও ভোট দেবার অধিকার আছে। এই সংখ্যাগুরুদের নানাবিধ প্রচণ্ড সমস্যা আছে। তাদের মধ্যে আছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সমস্যা এবং আছে তীব্র বাসস্থানের সমস্যা। তারা সবাই জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, টাটা-বিড়ালা বা রকফেলার নয়। তাদেরও হাত পা কাটলে রক্ত পড়ে, ব্যথা লাগে। সবশেষে এই সংখ্যাগুরুদের ভোটেই আজ তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে— সংখ্যালঘুদের ভোটে নয়, কারণ সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলে যেমন মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম, দেগঙ্গা, ভাঙ্গড়, ক্যানিং, হাসনাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে তৃণমূল ভোট পায় না, জেতেও না। তাই যাদের ভোটে তৃণমূল আজ ক্ষমতায় এসেছে তাদের কিছু সমস্যা তুলে ধরছি। আশাকরি মহামান্য তৃণমূল সরকার তার প্রতিবিধান করবেন :

(১) অবিলম্বে রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটি সংখ্যাগুরু মন্ত্রক গঠন করতে হবে এবং তার মাথায় একজন যোগ্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করতে হবে। তাঁর কাজ হবে সংখ্যাগুরুদের বিবিধ সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা।

(২) একটি সংখ্যাগুরু কমিশন গঠন করতে হবে যার কাজ হবে সংখ্যাগুরুদের প্রতি যাতে অবিচার ও বৈষম্য করা না হয় তার দিকে নজর রাখা।

(৩) অবিলম্বে প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা সদরে একটি করে সংখ্যাগুরু ভবন নির্মাণ করতে হবে।

(৪) সংখ্যাগুরুদের বাসস্থানের জন্য পর্যাপ্ত কলোনী গড়তে হবে।

(৫) সংখ্যাগুরু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলকাতায় এবং প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা সদরে পৃথক হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

(৬) অবিলম্বে বারাসতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস খুলতে হবে।

(৭) পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার দুঃস্থ পুরোহিতদের মাসিক ভাতা দিতে হবে। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংস্কৃত টোলকে সরকারি সাহায্য দিতে হবে।

(৯) পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে শত শত মন্দির ধ্বংসের পথে। অবিলম্বে সেগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার মানুষ কেদার, বদ্রী, অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী, মানস সরোবর, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী ইত্যাদি জায়গায় তীর্থ করতে যান। তাঁদের যাওয়া আসা ও থাকার খরচের অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক সরকারি খয়রাতী হিসাবে দিতে হবে।

(১১) কলকাতায়, কাকদ্বীপ ও গঙ্গাসাগরে একটি করে 'গঙ্গাসাগর ভবন" তৈরি করতে হবে যেখানে অন্তত পঞ্চাশ হাজার তীর্থযাত্রী স্বচ্ছন্দে কয়েকটা দিন থাকতে পারেন।

(১২) সকল সংখ্যাগুরু ছাত্র-ছাত্রীদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং সমেত সব উচ্চ শিক্ষার খরচ সরকারকে বহন করতে হবে।

(১৩) সংখ্যাগুরু চাকুরী প্রার্থীদের কাছ থেকে কোনও ফি নেওয়া চলবে না। তাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ দেওয়ার খরচ নেওয়া চলবে না।

(১৪) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সকল গ্র্যাজুয়েট চাকুরী প্রার্থীদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এ নাম রেজিস্ট্রি করার ৬ মাসের মধ্যে চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ তাদের মাসিক ৪ হাজার টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে।

(১৫) অনুরূপভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সকল মাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতীদের ৬ মাসের মধ্যে চাকুরী দিতে না পারলে তাদের মাসিক ২ হাজার টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে।

(১৬) সংখ্যাগুরুদের ব্যবসা বা শিল্প করার জন্য উদার শর্তে সরকারি ঋণ বা ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৭) বর্তমানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যাবতীয় টার্গেট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। অবিলম্বে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। হয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ফ্যামিলি প্ল্যানিং হোক, নচেৎ এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা একেবারে তুলে দেওয়া হোক। আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালু রাখতে হলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণের (যথা--- ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি বা ল্যাপরোস্কপি) কোটা যথাক্রমে ৭০ ও ৩০ শতাংশ বেঁধে দেওয়া হোক। সব ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার-এ প্রতি সপ্তাহে এই দুই সম্প্রদায়ের বন্ধ্যাত্বকরণের তালিকা আলাদাভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক।

১৮। নাবালক (২১-এর কম), নাবালিকা (১৮-র কম) যারা বিয়ে দেয় তাদের কঠোর শাস্তির (শুধু কাগজে কলমে নয়) ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত-কে কাজে লাগান। নাবালক-নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে না পারলে পঞ্চায়েতকে দায়ী করুন।

(১৯) একটি বাচ্চার পর স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ করলে পুরস্কার বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হোক। আর দুটির ক্ষেত্রে তা হোক ৩ হাজার টাকা। একটি বা ২টি বাচ্চার পর মানুষ যাতে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ করে তার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হোক।

(২০) দুইটি বাচ্চার পর বন্ধ্যাত্বকরণ না করলে ১০,০০০ টাকা জরিমানা ও জেলের ব্যবস্থা করা হোক (কেরলে এরকম ব্যবস্থা চালু আছে) এবং তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক।

(২১) মুর্শিদাবাদ (৬৩ শতাংশ), মালদা (৫২ শতাংশ), উত্তর দিনাজপুরে (৫৩

শতাংশ) মুসলিমরা সংখ্যাগুরু অথচ আশ্চর্যের বিষয় এইসব জেলায় তাদের দেওয়া হয় সংখ্যালঘু মর্যাদা এবং সেই অনুযায়ী সংখ্যালঘু প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা। আর হতভাগ্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যাগুরুর তকমা দিয়ে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। এর থেকে হাস্যকর অবিচার অবিলম্বে এই সব জেলায় হিন্দুদের সংখ্যালঘু ও মুসলিমদের সংখ্যাগুরু বলে সরকারি ঘোষণা করা হোক এবং সেই অনুযায়ী সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্টন করা হোক।

(২২) অবিলম্বে প্রত্যেক জেলা সদরে পাশপোর্ট অফিস খোলা হোক এবং সংখ্যালঘুদের ন্যায় বিনা ঝামেলায় দু'দিনে না হোক ৭ দিনের মধ্যে পাশপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

(২৩) গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুদের মতামতই প্রতিষ্ঠা পায়। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে কে আসবেন, যাবেন বা থাকবেন বা কার বই পড়া হবে তা সংখ্যাগুরুদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে, সংখ্যালঘুদের নয়।

(২৪) যারাই পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের দোহাই দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইবে তাদের কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করতে হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখানো চলবে না।

(২৫) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়। অবিলম্বে এইসব ভাঙ্গাচোরা রাস্তাঘাট যাতে মেরামত করে সুষ্ঠু যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় তার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

(২৬) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি! অন্ধকারে ডুবে আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

(২৭) সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে সরকারি চাকুরীতে কোনও সংরক্ষণ করা চলবে না।

—এস. কে. বসু, ৫৪ এম বি রোড, কলকাতা-৬০।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা ৭.০০ টাকা।
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা (সডাক)।

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

বর্তমানকালের সংবাদপত্রগুলি পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, ভারতের রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ এক গরিষ্ঠ সংখ্যালঘুর দুর্দশা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভাতা, বহুবিধ অর্থনৈতিক সুবিধা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ ইত্যাদি ঘোষণা করে চলেছে। তাদের দুর্দশা, পশ্চাদগামিতা ইত্যাদির কোনও কারণ নেতৃবৃন্দ খুঁজে বের করতে চায় না, যদিও তারাই ভারতে ৮০০ বৎসর রাজত্ব করেছে। অথচ তার পরের ২০০ বৎসরে তারা কেন পশ্চাদপর হয়ে গেল তার খোঁজ করা হলো না।

সারা পৃথিবীখ্যাত ভারতের ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীমৎ প্রভু জগবন্ধুসুন্দর— এঁরা প্রত্যেকেই বলে গেছেন— পৃথিবীতে সত্যযুগ নেমে আসছে। কলিযুগে অর্থাৎ গত পাঁচ হাজার বৎসর যে সব মত এসেছে তা চলে যাবে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র সনাতন ধর্মই থাকবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতে পাওয়া যায়, যদিও তিনি সব ধর্মকেই ঈশ্বরলাভের পথ বলে স্বীকার করেছেন, তবুও তিনি জানিয়েছেন, ''ইদানীং অনেক মত চলছে— এসব এসেছে চলেও যাবে, শুধুমাত্র সনাতন ধর্মই থাকবে।''

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজার মুসলমান কন্যাদের মধ্যে সতী দুর্গার শক্তি জাগরণের জন্য এক কাশ্মীরী মুসলমান কন্যাকে কুমারী পূজায় বসালেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সৃষ্ট বেলুড় মঠের আদি সংবিধানে লিখলেন, ভারত ঠিক বলেছেন, মুসলমান শাসনের ৮০০ বৎসরে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি থেকে ২০ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাই যারা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে, তাদের হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য বেলুড় মঠ কাজ করবে।

আজ ভারতের নেতৃবৃন্দ ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করুক। পৃথিবীশ্রেষ্ঠ ভারতের অবতার পুরুষ, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সাধকশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে চলে— পশ্চাদপর জাতির সামাজিক ও সার্বিক উন্নতির জন্য হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনুন। অন্যথায় তাদের আরও অজ্ঞান, অন্ধকার ও ধ্বংসের মধ্যেই ঠেলে দেওয়া হবে।

—অমরনাথ দে, রামহরি ঘোষ লেন, কলকাতা-৯।

নেই কোনও তফাৎ

'বর্তমান সরকারের বর্ষপূর্তিতে কিছু কথা' শিরোনামে কমল মুখার্জির লেখাটি (স্বস্তিকা ১৪ মে) অসংলগ্ন বলে মনে হলো। তিনি লিখেছেন ইমামদের ভাতা প্রসঙ্গে শুধু মমতাকে দোষ দিয়েই কী লাভ? সমস্ত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মুসলিম তোষণ তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, মমতা দেবী তোষণের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গিয়ে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করতে চলেছেন। সবে তো ক্ষমতায় আসা এক বছর হলো, সামনের চার বছরে তাঁর তোষণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে বিলকুল শঙ্কিত হতে হয়।

ইমামদের সম্মেলন, ইমামদের ভাতা, মুয়াজ্জিনদের মাসোহারা, মাদ্রাসার স্বীকৃতি, মুসলিম ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ, সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য আলাদা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, মুখ্যমন্ত্রীর ঘন ঘন ফুরফুরা সফর, তাঁর বেশভূষা, নিজেকে মুসলিম দরদী প্রতিপন্ন করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা— এসবের নিরিখে তো মনে হয় প্রতিবেশী দেশের দুই রাজনৈতিক নারীব্যক্তিত্ব শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও তফাত নেই, তফাত শুধু নামে।

—উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল, বিবেকানন্দ রোড, শেওড়াফুলি, হুগলি।

শোভাবাজার রাজবাড়ি-ছোট তরফ : দুর্গোৎসব

অর্ণব নাগ

রাজা নবকৃষ্ণদেবের নিজ পুত্র রাজকৃষ্ণের বংশের সপ্তমপুরুষ অলককৃষ্ণ দেব বিরচিত 'শোভাবাজার রাজবাড়ি : আমাদের বাড়ির কিছু কথা' একটি উৎকৃষ্ট পারিবারিক দলিল বলে বিবেচিত হবে। রাজকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গাপুজো সংক্রান্ত বহু পারিবারিক পরম্পরা সেখানে উল্লিখিত রয়েছে। আগেকার দিনে হিঁদু (হিন্দু)-র বাড়ি চিহ্নিতকরণে দোল- দুর্গোৎসবই মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রাধান্য পেত। আর এব্যাপারে শোভাবাজার রাজবাড়ির বড়, ছোট— উভয় তরফের খ্যাতিই সর্বজনবিদিত। ১৭৫৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণ অধুনা ৩৩ আর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সিংহদরজাওয়ালা বাড়িতে (যা পরে দত্তকপুত্র গোপীমোহন উত্তরাধিকার সূত্রে পান) দুর্গাপুজোর সূচনা করেন একথা আমাদের জানা। পরবর্তীকালে স্বীয় পুত্র রাজকৃষ্ণের জন্মের পর আদিবাড়ির দক্ষিণদিকে যে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করে (অধুনা যার ঠিকানা ৩৬ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট) উঠে আসেন তিনি সেখানে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় ১৭৯০ সালে।

অলককৃষ্ণ দেবের পারিবারিক দলিল অনুযায়ী, রাজবাড়িতে মা দুর্গাকে কন্যারূপে পুজো করা হয়। শাক্ত মতে দুর্গাপুজো হয় বলে বাড়ির গৃহদেবতা (গোপীনাথ জীউ)-কে ত্রয়োদশীর দিন ঠাকুর দালান থেকে ওপরে দোতলায় রাখা হয়। গত সংখ্যাতেই উল্লিখিত হয়েছে, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় মাটির প্রতিমা না করে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত যুগলমূর্তি (গোপীনাথ-রাধারাণী) থেকে রাধারাণী দেবীকে মা-লক্ষ্মী হিসেবে পুজো করা হয়। সেই প্রথম থেকে যে নিয়ম আচার শুরু হয়েছিল আজ দু'শো বাইশ বছর পার করেও তার কোনও ব্যত্যয় হয়নি। রাজবাড়ির বংশধরেরা সযত্নে সেই প্রাচীন ধারাটিকেই প্রবহমান রেখেছেন। দুর্গা প্রতিমাকে কৃষ্ণনগর থেকে ডাকের সাজ এনে পরানোর রেওয়াজ। উল্টোরথের দিন কাঠামো পুজো করা হয় এবং বাড়িতেই ঠাকুর তৈরি করানো হয়। প্রতিমার গড়ন, মাপ, মুখের ছাঁচেও দু'শো বাইশ বছরের বনেদীয়ানার ছাপ। মহানবমীর আগের নবমীতে বোধন বসে। সেদিন থেকে ব্রতী ব্রাহ্মণরা এসে ঠাকুর দালানে পুজোর দিন পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ, বেদপাঠ, রামায়ণ পাঠ, মধুসূদন যর্জুবেদ, ঋগ্বেদ ইত্যাদি পাঠ করেন। ওইদিন পণ্ডিত বিদায় (প্রণামী) অনুষ্ঠান হয়, কলকাতা এবং বাইরে থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসেন। রাজবাড়ির লোকেরা জাতে অব্রাহ্মণ মানে কায়স্থ, তাই পুজোয় অন্নভোগ নৈব নৈব চ। বাড়িতে 'ভিয়েন' ঘরে তৈরি 'মিঠাই' ভোগ দেওয়া হয়। এই 'মিঠাই'য়ের যে লম্বা ফিরিস্তি অলককৃষ্ণ দেব দিয়েছেন তা উল্লেখ করি, "খাস্তা কচুরি, রাধাবল্লভী, সিঙাড়া, নিমকী (ঘন মোটা ও পদ্মকাটা পাতলা, দু'ধরনের), গজা (স্বাদের ভিত্তিতে দু'রকমের— মিঠে ও মিষ্টি এবং আকৃতির ভিত্তিতেও দু'ধরনের— ডুমো ও জিভে অর্থাৎ মোট চার প্রকারের গজা), জিলিপি, দরবেশ (লাল মিষ্টি), মতিচুড় (সাদা মিষ্টি), পান্তুয়া, নোড়া পান্তুয়া, পেরাকী, পক্কান, খাজা, কটকটি নাড়ু, ঘন শোন পাপড়ি, ক্ষীর তক্তি, লবঙ্গলতিকা, মুগের নাড়ু, তিলের নাড়ু, পূর্ণচন্দ্রপুলি, বালুসাই, চাঁদসই, মগধ, মুটরি, সমেশা, খুরমা, সোহাগিনী, বিনোদিনী, পুরকান্তি।" কিন্তু আফশোসের বিষয় উপযুক্ত কারিগরের অভাবে শেষ আটটি পদ অর্থাৎ চাঁদসই থেকে পুরকান্তি পর্যন্ত পদগুলি এখন আর হয় না। পদগুলি সুস্বাদু নিশ্চয়ই কিন্তু তার নামের বাহার যে চেখে দেখার ইচ্ছেটাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয় তা বলাই বাহুল্য। মানে এহেন লম্বা খাদ্যতালিকায় উপরের দিকের মিষ্টিগুলির নাম কলকাতার বনেদীয়ানার সঙ্গে পরিচিত মানুষজনের জানা আছে। কিন্তু শেষের আটটি মিষ্টি একান্তভাবেই শোভাবাজার রাজবাড়ির।

ছোট তরফে পাঁঠাবলির রেওয়াজ এখনও বিদ্যমান। সন্ধিপুজোর সময় ১০৮টি প্রদীপ জ্বেলে পুজো আরম্ভ হয়। আগে এই পূজারম্ভের সময় কামান বা বন্দুকের শব্দ করা হোত। দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় একটি নীলকণ্ঠ পাখি ছেড়ে দেওয়ার রীতি ছিল এবং গঙ্গাতীরে নৌকায় প্রতিমা তুলে নৌকা ছাড়ার সময় আরও একটি নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়া হোত। 'রীতি ছিল', 'পাখি ছাড়া হোত' ইত্যাদি 'পাস্ট টেনস' ব্যবহার করতে হচ্ছে কারণ সম্প্রতি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো এখন দু'টো মাটির নীলকণ্ঠ পাখি তৈরি করে বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা'র সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা নিরঞ্জনও দেখবার জিনিস, গঙ্গার তীরে দু'টি বড় নৌকা একসঙ্গে জুড়ে মাঝখানে ফাঁক রেখে লাগানো থাকে, ওই ফাঁকে দুর্গা প্রতিমা বসানো হয়। নৌকাদ্বয়কে গঙ্গার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে সেই ফাঁকদিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

রাজার বাড়ির পুজো বলে কথা। মা দুর্গা নিরাভরণ থাকবেন তাই কখনও হয়? গয়না-র বহরটা খালি শুনুন একবার— সোনার জড়োয়া মুকুট, সবুজ পান্না বসানো সিঁথি মৌর, টায়রা, টিকলি, কানপাশা, ঝুমকো দুল, কানচাপা, ইয়ারিং, ঝাড়বাতি দুল, নাকছাবি, ফাঁদি নথ, নোলক, সাতনরি, মপচেন, সীতাহার, নেকলেস, হিরে বসানো সোনার চিক, মুক্তোর কলার, মুক্তোর শেলি, তাগা, আর্মলেট, বাউটি, চুড়ি, পিঙখারু (সরু চুড়ি), কাঁকন, বালা, রিস্টলেট, রতন চুড়, আংটি, বিছে হার, গোট চেন, চুনি পান্নার হার, পান্নার চাপকলি, মকর কুণ্ডল, সোনার গজরি, হিরের ফুল, চুনির বাজু।

দুর্গোৎসবে বাঈনাচ শোভাবাজার রাজবাড়িতে চালু হয়েছিল রাজা নবকৃষ্ণের আমল থেকে। রাজকৃষ্ণের আমলে তা অন্য মাত্রা পায়। যেসব বিখ্যাত বাঈজী নাচঘর আলো করেছিলেন, তাঁরা হলেন— মিস র‍্যাংহাম, লিভিয়াস, নিকী, বেগমজান, আমরান বাঈ, সৈয়দ বকস্, সুপনজান, হিঙ্গলবাঈ, নূরবকস্, মিশ্রী বাঈ, জিন্নাৎ আর্জি, ফৈয়স বকস্, অসরুন, মালকা জান, গহরজান। ১৯৪০ সালের পরে বাইনাচ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

আগে একমাস ধরে উৎসব চলতো। বাঈনাচ ছাড়াও যাত্রা, থিয়েটার, হাফ আখড়াই, কবির লড়াই, তরজা, পক্ষীদলের আড্ডা, সঙের নাচ ইত্যাদিই ছিল বিনোদনের মূল মাধ্যম। দু'রকম আমন্ত্রণপত্র বিলি হোত। একটা সংস্কৃত ভাষায় দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য আর একটি ইংরেজিতে সাহেব-সুবোদের জন্য। তাতে নাচের ইংরেজি 'NATUCHES' লেখা থাকতো। বর্তমানে সংস্কৃত ও বাংলা মেশানো আমন্ত্রণ পত্র হয়। সময়ের স্রোতে আগেকার সেই জাঁকজমক, জৌলুস এখন অনেকটাই অস্তমিত।

রাধামোহন জীউ মন্দির

লালগড়ের জাগ্রত দেবতা

শ্রীশ্রী রাধামোহন জীউ

বাসুদেব পাল

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ দৈনিক কাগজের শিরোনামে বার বার উঠে এসেছে একটা নাম—'লালগড়'। মাওবাদীদের 'গড়'। যদিও এটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয় বা বড়জোর অর্ধসত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, লালগড় সন্নিহিত জঙ্গলে মাওবাদীদের ডেরা গড়ে উঠেছিল। তবে কিষাণজীর মৃত্যুর পর সেই রমরমা আর নেই।

কিন্তু এই লালমাটির লালগড় এবং সন্নিহিত অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে ধর্মভীরু, ধার্মিক, সদাচারীদের বাসভূমি বলেই সমধিক পরিচিত। যদিও দুষ্ট-প্রকৃতির মানুষ একেবারেই নেই একথা বলা যাবে না। স্বাধীনোত্তর- কালে রাজনৈতিক মারামারি বা কাটাকাটির ঘটনা প্রায় নেই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এবং পঞ্চায়েত রাজনীতি শুরু হওয়ার পর দু'দিনের ভোট-রাজনীতি বারোমাসের রেষারেষির রাজনীতিতে পরিণত হয়।

লালগড় ও লালগড় থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে রামগড়। দু-ভাই-এর দুই জমিদারী, যেখানে জঙ্গলমহল এবং জনজাতিদের বাসই বেশি। জনশ্রুতি, বর্তমান জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ রামরায় ও লক্ষ্মণলাল উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা তৎকালীন যুগে পুরীর জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে পথ হারিয়ে এই জঙ্গলমহলে পৌঁছান এবং বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদার হয়ে রাজ্যপাটে বসেন। রামগড়ের তুলনায় লালগড়ের জমিদারী বেশ বড়। রামের নামে রামগড় আর লক্ষ্মণলাল বসালেন লালগড়।

জমিদারী পত্তনের পর একটা ঠাকুরবাড়ি না হলে চলে কীভাবে? জমিদাররা লালগড়ের ঠিক মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করলেন ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির। জমিদারদের কুলদেবতা 'রাধামোহন জীউ'। নিত্যপুজোর ব্যবস্থা হলো দেবোত্তর সম্পত্তি

পরম্পরা

মারফত। হয়তো পুরীর রথযাত্রা জমিদারদের মনে ছাপ ফেলেছিল। সেজন্য ধূমধাম সহকারে প্রতিবছর রথযাত্রা। ওই সময় যাত্রাগান, সার্কাস, পুতুলনাচসহ নানারকম লোকরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান হোত। রথের দিন পুরীর অনুকরণে রাধামোহন জীউ রথে চড়ে মূল মন্দির থেকে এক কিমি'র বেশি দূরে বাজার পার হয়ে কংসাবতী নদীর একটু উপরে মাসীর বাড়ীতে যান। ওখানেই উল্টোরথ পর্যন্ত অনুষ্ঠান। রথযাত্রার দিন লোকে লোকারণ্য। পুরো রাস্তাটাই ভিড়ে একাকার। রথের দড়ি স্পর্শ করতে সে কী হুড়োহুড়ি! সারা রাস্তা জুড়ে সার সার মনোহারি জিনিসের দোকান।

যাত্রাগানের দল একসময় কলকাতা থেকেও যেত। তাঁবু পড়ত সার্কাসের। 'এখন সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।' ইন্দিরা গান্ধী জমিদারী প্রথা বিলোপ করলে পুরনো জমিদারদের ক্ষতিপূরণ (কমপেনসেশন) দেওয়া হয়। সেটা ১৯৭৩ সাল। সেবছর খুবই ধূমধাম সহকারে যাত্রার জন্য মণ্ডপ ও সাতদিনের মাসীর বাড়ির সংস্কার হয়। ধূমধাম সহকারে রথযাত্রা পালিত হয়, সংস্কার হয় রাধামোহন জীউ মন্দিরেরও। তারপর ক্রমশ নানাকারণে সেই জৌলুস আর নেই। মূল মন্দির দেখলেই বোঝা যায় কতকাল সংস্কার হয়নি। সারা লালগড় পরগণার মানুষ যে কোনও শুভকাজে রাজাদের ঠাকুরবাড়িতে রাধামোহন জীউ-র পুজো দিয়ে শুরু করতেন। এলাকার মানুষের কাছে আজও রাধামোহন জীউর মান্যতা একইরকম। বাড়ির চুড়োতে, প্রবেশের দরজার পাশের দেওয়ালে এখনও লালগড়বাসীরা বিশ্বাস ভরে লিখে রাখেন শ্রীশ্রী রাধামোহন জীউ শরণম্।

শোনা যায় মন্দির, বিশাল পুষ্করিণী এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বর্গীয় জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহস রায়। সেদিনের জুনিয়ার ও ম্যাট্রিক স্কুল এখন বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়। সহস্রাধিক ছাত্রী-ছাত্রী। স্কুলের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের নিবিড় যোগাযোগ আজও অটুট। সামান্য দূরে রয়েছে রামকৃষ্ণ স্বর্গাশ্রম। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত। একজন সন্ন্যাসী মহারাজ ওখানে থাকেন।

এছাড়া লালগড়ে ব্লক অফিসের পিছনে জঙ্গলের গা ঘেঁসে জমিদারদের আনুকুল্যে প্রদত্ত জায়গায় স্বামী সচ্চিদানন্দগিরি প্রতিষ্ঠিত (১৩৫৮ বঙ্গাব্দে) **শংকর বাণপ্রস্থ আশ্রম তপোবন** লালগড় ও আশপাশের মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছে। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন মানুষের মন থেকে ধর্মভয়কে মুছে দিতে পারেনি, বরং দুর্যোগের দিনে মানুষ ভগবানকেই বেশি করে ভরসা করছে।

তীর্থযাত্রা গয়া

গয়া হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থানের অন্যতম। সারাবছরই লক্ষ লক্ষ হিন্দুযাত্রী আসেন গয়ায় তাঁদের মৃত আপনজনদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনার্থে পিণ্ডদান করতে। বায়ু পুরাণে গয়া মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যদি কেউ মেষ, কন্যা, ধনু, কুম্ভ, মকর ও মীনের চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের সময় গয়ায় পিণ্ডদান করেন তবে তার তুল্য ফল তিনলোকেও দুর্লভ। বহু যুগ আগে গয়াসুর দৈত্য ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ করার ইচ্ছা করে তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সেই দৈত্যের মাথায় একখণ্ড পাথর রেখে মুক্ত করেছিলেন। এই স্থানেই ভগবান বিষ্ণু গদাধর নামে সর্বদা বিরাজ করছেন। এই স্থানে ঋষিরা দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার দান করেছিলেন। সেই থেকে পিতৃলোক সর্বদা মনে করেন যে বহু পুত্রের মধ্যে যদি একটি পুত্রও গয়ায় এসে পিণ্ডদান বা অন্নদান করেন তবে পিতৃপুরুষগণ মুক্ত হবেন।

গয়ায় পিণ্ডদান করলে আত্মার স্বর্গারোহণ হয়। শৈলমালার শোভাই গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্ম যোনি পর্বতের বিষয়ে লেখা রয়েছে। গৌতমবুদ্ধের স্মৃতি চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য সম্রাট অশোক এই শিখরের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আজ আর তার কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। গয়া জেলার দক্ষিণ সীমানায় হাজারিবাগ জেলা আরম্ভ হয়েছে। এখানে কৌলেশ্বরী পাহাড় রয়েছে। তার শৃঙ্গে রয়েছে কৌলেশ্বরী দেবীর মন্দির। এই পর্বতের উপর দ্বাপর যুগের শেষে বিরাট রাজার নগর ছিল। পুরাতন কেল্লার সীমার চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। প্রাচীনকালে এখানে পিণ্ডদান করতে হলে এক বছর সময় লাগত। প্রতিদিন একটি করে ৩৬০ স্থানে পিণ্ড দিতে হোত। বর্তমান সময়ে ৪৫টি বেদীর অস্তিত্ব রয়েছে মাত্র।

কীভাবে যাবেন :

কলকাতা থেকে ঘণ্টা আটেকের পথ, দূরত্ব ৪৫৮ কিমি.। হাওড়া থেকে ১২৩২১ মুম্বাই মেল ভায়া ইলাহাবাদ, ছাড়ে রাত ১০টায়, পৌঁছবে ভোর ৫টা ২২ মিনিটে। ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস ভায়া গয়া ছাড়ে সকাল ৮-২০ মিনিটে, পৌঁছবে বিকেল ৪টায়। ১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত ১১-৩০ মিনিটে, দুন এক্সপ্রেস এবং কলকাতা স্টেশন থেকে ১২৩১৯ আগ্রা এক্সপ্রেস ছাড়ে কেবল বুধবার সকাল ১৩-১০ মিনিটে। ১৩১৫১ জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ১১-৪৫ মিনিটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া রিজারভেশন সহ ২২০ টাকা।

গয়া থেকে পাটনার দূরত্ব ৯২ কিমি.। ঘণ্টা তিনেকের পথ।

গয়ায় বিষ্ণুপদ মন্দির

নবকুমার ভট্টাচার্য

কোথায় থাকবেন :

বাঙালী যাত্রীদের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের ধর্মশালা উল্লেখযোগ্য। এখানে রয়েছে যোগ্য পুরোহিতকুল। সামর্থ্য অনুসারে পিণ্ডদান করতে সবরকমের সহায়তা দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। তবে নকল ভারত সেবাশ্রম সংঘও রয়েছে এখানে। তাই সচেতনতা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে গয়ায় রয়েছেন সংঘের দুজন যোগ্য সন্ন্যাসী-তপন মহারাজ ও ভাস্করানন্দ মহারাজ।

যোগাযোগ : ভারত সেবাশ্রম সংঘ। Swarajyapuri Road, Goya, Bihar-823001. Ph. Ashram-0631-2220579. Station Office 2220929. এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

কী দেখবেন :

বিষ্ণুপদ মন্দির : পৃথিবীতে বিষ্ণুর পদচিহ্ন রয়েছে এমন একমাত্র স্থান। রেল স্টেশন থেকে ২.৪ কিমি.। চরণ চিহ্নটি দৈর্ঘ্যে ১৩ ইঞ্চি এবং অঙ্গুলগুলি উত্তরাভিমুখ। ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই ১৭৮৭ সালে মন্দিরটি সংস্কার করে দেন। মন্দিরটি তৈরি করেন কলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব।

ব্রহ্মাণী পাহাড়ে রয়েছে অক্ষয় বট। বটবৃক্ষ তলায় পিণ্ডদান করা হয়। প্রবাদ রয়েছে এই বৃক্ষ ত্রেতাযুগ থেকে এই স্থানেই রয়েছে। রয়েছে প্রেতশিলা। ৪০০ সিঁড়ি ভেঙে প্রেতশিলা পাহাড়। নীচে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানে পিণ্ডদান করলে মৃত প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার হয়। ফল্গুতীরে রয়েছে মা গয়েশ্বরী মন্দির এবং নদীর অপর পারে সীতাকুণ্ড। মন্দিরের ভেতর কালো পাথরের একটি হাত রয়েছে। এই হাত নাকি রাজা দশরথের। রাজা দশরথের মৃত্যু হলে রাম লক্ষ্মণের অবর্তমানে মা জানকী এই স্থানে শ্বশুরের পিণ্ডদান করেছিলেন এবং রাজা দশরথ হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও পরে ফল্গু মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে জানকীর শাপে আজও অন্তঃসলিলা আর অক্ষয়বট সত্যবাদিতার জন্য আজও অক্ষয়।

দেখার রয়েছে :

ভারত সেবাশ্রমের কাছে গয়া সিভিল কোর্টের সামনে থেকে ছাড়ছে অটো বা সিটি সার্ভিসবাস, নিয়ে যাচ্ছে বুদ্ধগয়া। ভাড়া জনপ্রতি বাসে আট টাকা এবং অটোতে দশ টাকা। এছাড়া গয়া থেকে বাস ছাড়ছে রাজগীর, নালন্দা, পাওয়াপুরী দেখার জন্য।

অন্যরকম ঘটনা

পবন দাদু তামাক খাওয়া ছাড়লেন ছোটোদের কথায়

তামাক খাওয়ার অভ্যেস ছিল পাড়ার পবনদাদুর। বয়স এখন চুয়াত্তর। রোজ দু-প্যাকেট সিগারেট তাঁর চাই। এই অভ্যেসটা রপ্ত করেছেন ষোল বছর বয়স থেকে। চাকরি করতেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে। কখনও কাউকে সিগারেট দিতেন না। পরের কাছ থেকে নিতেন যখন তখন। বাড়িতে মেয়ে বউ কখনও তামাক খাওয়া সমর্থন করেনি। কিন্তু বড় জেদি মানুষ পবন দত্ত। বলেছেন, ‘সিগারেট খাওয়া ছাড়তে পারবো না।’ অশান্তি হয়েছে যথেষ্ট। পঞ্চাশ বছর ধরে তামাক খেয়ে কম টাকা খরচ হয়নি। ধোঁয়ায় উড়ে গেছে। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হচ্ছে। দমের কষ্ট দেখা দিচ্ছে। ডাক্তাররা পরামর্শ দিচ্ছেন, ‘তামাক খাওয়া ছাড়ুন। নয়তো বিপদ আসতে দেরি হবে না।’ পবন দত্ত বলেন, ‘এত বছর ধোঁয়া খেয়েছি, শেষ বয়সে ছাড়তে পারবো না।’

পবন দত্ত দেখতে পেলেন তামাক-বিরোধী দিবস ৩১ মে সকালে পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনেকরকম উদ্যোগ নিয়েছে। তামাকের বিরুদ্ধে প্রচারে যারা নেমেছে তাদের মধ্যে রয়েছে দিবাকর মুখার্জি। ঝকঝকে তরুণ। তার বাবা কয়েক বছর আগে ক্যানসারে মারা গেছে। প্রচুর সিগারেট খাওয়ার জন্যেই ক্যানসার হয়েছিল। নানারকম পোস্টার, লেখায় পাড়া ছেয়ে গেলো। তামাক-বিরোধী মিছিল বেরোল। পবন দত্তর মেয়ে বউ মিছিলে হাঁটল। দিবাকর ডাকল, ‘পবনদাদু, তুমি সিগারেট ছাড়ো— এটা আমরা চাই। তুমি সেটা শুনবে কি শুনবে না— তা তোমার ব্যাপার। পাড়ায় তামাক-বিরোধী দিবস হচ্ছে। তুমি আসবে, হাঁটবে মিছিলে।’ পাড়ার ছেলেমেয়েরা এমনভাবে কথা বলে রাজি হতেই হয়। সারাটাদিন পবন-দাদুকে ব্যস্ত রাখল ছেলেমেয়েরা। সিগারেট খাওয়ার ফুরসত পেলেন না। পাড়ার কোনও দোকান সিগারেট বিক্রি করছে না ওইদিন। রাস্তা দিয়ে কেউ সিগারেট খেতে খেতে গেলে দিবাকররা বলছে, ‘ফেলে দিন সিগারেট।’ শুধু সিগারেট নয়, অন্যান্য তামাকের জিনিসের বিরুদ্ধেও প্রচার চলল।

সন্ধ্যেবেলা সভায় কিছু বলার জন্যে পবন-দাদুকে ডাকল দিবাকর। পবন বললেন, ‘আমি তামাকের পক্ষে রয়েছি বরাবর। আজ এদের আন্তরিক উদ্যোগ প্রচার দেখে অভিভূত। মনে হয়, আমিও অন্যায় করছি। আজ সারাদিনে সিগারেট খাইনি। আজ সকলের সামনে বলছি, আমি তামাক ত্যাগ করলাম। ডাক্তার ভয় দেখিয়ে পারেনি ছাড়াতে। মেয়ে বউ ঝগড়া করে ছাড়াতে পারেনি। পাড়ার ছেলের দল পারল আমাকে তামাক ছাড়তে। এখন থেকে আমি তামাকের বিরুদ্ধে প্রচারে থাকবো সবসময়।’

দিবাকরের দলবল শুনে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল পবন দত্তের সিদ্ধান্তকে।

কৌশিক গুহ

অন্য বার্তা

আগুন থেকে নগর রক্ষা

খবরটা চমকে যাওয়ার মতো। প্রতি বছরে রাশিয়ার এক লক্ষ দশ হাজার শহরে আগুন লাগে। ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ন’ বছর আগে আগুন লাগার সংখ্যাটা ছিল দু’ লক্ষ চল্লিশ হাজার। আস্তে আস্তে আগুন লাগার ঘটনা কমে যাচ্ছে। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা কমছে।

রাশিয়ার আপতকালীন মন্ত্রী সারগেই সোইগু। তিনি বলেন, আগুন প্রতিরোধের কাজ বাড়াতে হবে। সে চেষ্টা হচ্ছে দেশজুড়ে। স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে কাজ চলেছে আগুন মোকাবিলার জন্যে।

রাশিয়ায় ওইরকম স্বেচ্ছাসেবক দেড় লক্ষের বেশি। সেটা এবার আট লক্ষ সংখ্যায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

২০১৪ সালে দশ লক্ষ ফায়ার ফাইটার ও উদ্ধারকারী কাজ করবে।

বার্তাবহ

চন্দন স্যারের আঁকার ক্লাস

ছবি দেখার আগ্রহ থাকবে সকলের

চন্দন-স্যার আঁকার ক্লাসে কখনও নিজের চেয়ারে বসেন না। ঘুরে ঘুরে ক্লাস করেন। কখনও শেষ বেঞ্চে বসা অরুণাভর পাশে বসে তার কাজ দেখেন। আঁকার সময় কোন জায়গাটায় অসুবিধে হচ্ছে দেখিয়ে দেন। থার্ড বেঞ্চের চঞ্চল রঙ করে ইচ্ছেমতো। চন্দন-স্যার তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'তোমার যেমন মনে হচ্ছে তেমনি রঙ করো।' সেকেন্ড বেঞ্চের অরিত্র পেনসিলে আঁকতে গিয়ে বার বার মুছছে। ভুল হচ্ছে ভেবে মুছে ফেলছে। স্যার পিছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন। বললেন, 'মুছো না রেখে দাও। পাশের জায়গাগুলো ফাঁকা রাখবে? না ভরিয়ে দেবে?' অরিত্র উৎসাহ পেয়ে এঁকে ফেলল। চন্দন-স্যার বলেন, 'কেউ ভালো আঁকবে। কেউ আস্তে আস্তে শিখবে।' আঁকার খাতা রঙ তুলির যত্ন নিতে বলেন সবসময়। ক্লাসের যেসব ছেলে আঁকায় উৎসাহ পেত না আগে, তারা প্রত্যেকেই মোটামুটি আঁকতে পারে। চন্দন স্যারের ক্লাসে কোনওরকম বকাঝকা নেই। শুধুই মজা। মাসে একদিন স্যার ক্লাসে এসে বলেন, 'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে সাদা কার্ড দেবো তোমরা তাতে যা খুশি এঁকে জমা দাও। পিছনে নাম আর ক্লাস লিখবে।' আঁকার স্বাধীনতা পাওয়ায় ছোটোরা এঁকে ফেলল মনের আনন্দে অনেক কিছু। সারা বছরে ওইভাবে অনেক কার্ড ছবি আঁকা হয়ে যায়। কয়েকটি বাছাই-করা ছাপা হয় স্কুল-ম্যাগাজিনে। বাকি ছবি প্রদর্শনীতে টাঙানো হয়। পরে ছবিগুলো যত্নে সাজিয়ে রাখেন নিজের হাতে তৈরি অ্যালবামে। ছোটোদের চন্দন স্যার বলেন, 'বড় হয়ে আঁকো না আঁকো, ছবি দেখার আগ্রহটা হারিয়ে ফেলো না কখনও।' অনেক ছাত্র তাঁর সঙ্গে পরেও যোগাযোগ রাখে ছবির টানেই।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক আরেকজন বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী 'নাইটহুড' ত্যাগ করেননি। নাম?

২. দাদা সাহেব ফালকে বিজয়ী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি?

৩. সৌমিত্র ছাড়া আরও কয়েকজন বাঙালি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম?

৪. লালকৃষ্ণ আদবানি প্রথম জীবনে কোন্ পেশায় ছিলেন?

৫. বাঙলায় ক্রিকেট ও ফুটবল--- দুই খেলাতেই অধিনায়ক হয়েছিলেন কে?

উত্তর : ১. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ২. অপুর সংসার। ৩. সত্যজিৎ রায় ও অশোককুমার। ৪. চলচ্চিত্র সাংবাদিক। ৫. চুনী গোস্বামী।

ছোটোদের বলছি

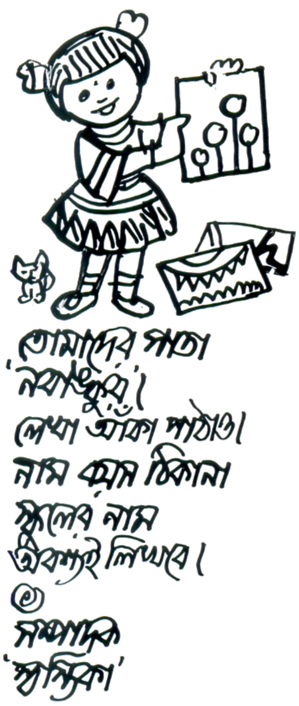

উলটো পালটা

১.

বাসেট্রামে চলার সময় অনেকেই বেশ তিরিক্ষি মেজাজে থাকেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই তাঁদের একইরকম ব্যবহার। কেউ পাশে বসলে অপছন্দ করেন। নিজে বসেন অনেকটা জায়গায় হাতপা ছড়িয়ে। অন্য কেউ এভাবে বসলে বলেন, 'গাড়িটা বাড়ির বৈঠকখানা নয়।' কোনও কোনও সহযাত্রী বলেন, 'অমন মেজাজে বলবেন বাড়ির কাজের লোক বা ছেলেকে।' আরেক সহযাত্রী বললেন, 'এটা সরকারি বাস। দেখুন লেখা আছে এগাড়ি আপনার সম্পত্তি। অতএব নিজের সম্পত্তি খোশ মেজাজে ব্যবহার করতেই পারেন!'

২.

বাস থেকে নামার সময় ঠেলাঠেলি হচ্ছিল। সকলেরই তাড়া। সামনে দাঁড়ানো এক বয়স্ক মানুষ বললেন, 'একসঙ্গে এত লোককে গোরু ছাগলের মতো তুলবে!'

একজন বললেন, 'গোরু ছাগলের গাড়িতে এর আগে চড়েছেন নাকি দাদু?'

৩.

বাসে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল ভিড়ের চাপে। একজন চট করে চটে ওঠায় অভ্যস্ত যাত্রী বললেন পিছনের যাত্রীকে, 'হাত দিয়ে ঠেলছেন কেন?'

পিছনের যাত্রী বললেন, 'হাত দিয়ে ঠেলছি ভিড়ে। পা দিয়ে ঠেলাটা কি ভালো হোত?'

রাগী যাত্রী কিছু না বলে নেমে গেলেন।

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

বিজ্ঞানের মহাকাশে এক জ্যোতিষ্ক

মাদাম ক্যুরি

যোগমায়া বসু

বিশ্বের প্রথম নোবেলজয়ী মহিলাবিজ্ঞানী মেরি ক্যুরি— পুরো নাম মারিয়া স্ক্লোদোয়াস্ক। এখানে বলে রাখি— তিনি শুধু একবার নন, দু-দুবার নোবেলজয়ী হয়েছিলেন। একবার ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় আরও দু-জনের সঙ্গে যৌথভাবে এবং ১৯১১ সালে এককভাবে রসায়নশাস্ত্রে।

১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর তিনি পোল্যান্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম স্ক্লোদোয়াস্কো। তিনি ওয়ারশ' হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

মেরি ক্যুরি সেকেন্ডারী স্কুলে শিক্ষালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছ থেকে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু শিক্ষা হাতে কলমে লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে উচ্চবিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নে ভাল ফল করেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে স্কুলশিক্ষা শেষ করার সময় পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও স্বর্ণপদক লাভ করে স্কুল শিক্ষা শেষ করেন।

সে সময়ে পোল্যান্ড রাশিয়ার জার সম্রাটদের অধিকারে ছিল। জার সম্রাটদের শাসনের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডবাসীরা মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ করতেন। মেরির পিতাও তাতে যোগ দেন। ফলাফলে রাজরোষে পড়ে তিনি শিক্ষকতার চাকরীটি হারান। মেরিদের সংসারে দারুণ দারিদ্র্য নেমে আসে। মেরি শিক্ষকতা করে পরিবারটিকে দাঁড় করিয়ে রাখেন, এমন কি বোন ক্লোনিস্লাওয়াকে ডাক্তারী পড়তে অর্থ সাহায্য করেন।

মেরি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, রুশ ও জার্মান ভাষা শিক্ষালাভ করেন। সে সময়ে তাঁদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পড়ার সুযোগ না থাকায় উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিক সায়েন্স ফ্যাকালটি সরবোঁ ইউনিভারসিটিতে স্নাতকোত্তর পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রথম কোয়ার্টার ক্লাস-এ ভর্তি হন। সে সময়ে তাঁর দিদি প্যারিসেই ডাক্তারী পড়বার জন্য ছিলেন। ফলে মেরির থাকবার অসুবিধা হলো না ঠিকই, কিন্তু দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে পড়ে গেলেন। দিন এমনও গিয়েছে যে তাঁকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পড়াশুনা ছাড়েননি। পদার্থবিদ্যা পরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন এবং পরের বছর স্নাতকোত্তর পরীক্ষার গণিত শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এসময় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও চুম্বক বিশেষজ্ঞ পিয়ের ক্যুরির সঙ্গে পরিচিত হন ও পরে তার সঙ্গেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

বিয়ের পরই ক্যুরি দম্পতির জীবনে সাফল্যের ইতিহাস শুরু হয়। তাঁদের দুইকন্যা— আইরিন ও ইভ। তাঁরাও নোবেল জয় করেছিলেন। ইভ তাঁর মায়ের জীবনকথা 'মাদাম ক্যুরি' জীবনীটি লিখেছিলেন। বইটি পরে বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মাদাম ক্যুরি সংগ্রাম যেমন করেছিলেন, তেমন জীবনে বহু সম্মানীয় পদ ও ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ডক্টর অফ সায়েন্সে ডিগ্রি অর্জন করে তিনি ফ্রান্সের প্রথম মহিলা ডক্টরেট হন। ওই সময়েই বিভাগীয় প্রধান হয়ে তিনি সরবোঁতে তাঁর স্বামীর উত্তরাধিকারীও হলেন। এই প্রথম একজন মহিলা, যিনি এত উঁচুপদ পেলেন।

মাদাম ক্যুরি শিশুকাল থেকেই পদে পদে বিভিন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কোন বিপর্যয়ই তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি। মাত্র দশ বছর বয়সে অকস্মাৎ মাতৃহারা হয়েছিলেন। দারুণ শোকে তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজ লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলছিলেন। তেমনি এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামী পিয়ের ক্যুরি যখন হঠাৎ মারা যান, তখনও তিনি ভেঙে পড়েননি। তখন তাঁর মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়স। বিপর্যয় সামলে নিয়েই তিনি স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য একাই উঠে পড়ে লাগেন। পিয়ের ক্যুরির মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যাপকের পদটি শূন্য হয়েছিল সেই পদটি মাদাম ক্যুরি অলঙ্কৃত করেন। তিনি বিজ্ঞানের ফ্যাকালটিতে প্রফেসর অফ জেনারেল ফিজিক্স হলেন। এটিতেই তিনি শিক্ষার এমন উঁচু পদে প্রথম মহিলা।

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ফরাসী সরকার তাঁকে 'লিজিয়ন অফ অনার' দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁর স্বামী একসময় তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের কর্মের পথে চলতে চলতেই তিনি একদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দিনটি ছিল ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই। মাদাম ক্যুরি দু-বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। একজনের দু-বার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

মাদাম ক্যুরি শুধুমাত্র গবেষণাই করেননি। গ্রন্থ রচনা, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহত সেনাদের শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। তাঁর গুণের জন্য বিশ্ব কোনওদিন তাঁকে বিস্মৃত হতে পারবে না।

বুদ্ধিজীবী উপাখ্যান

নটরাজ ভারতী

ফের পথে নেমেছেন বুদ্ধিজীবীরা। আবার কলকাতার রাস্তায়। হাঁটছেন। নাচছেন। বাইট-বিশেষজ্ঞের মতো 'বাইট' দিচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীদের এই বাইট যে নেহাতই ঢোঁড়া সাপের কামড় তা আম-জনতা জানে, শুধু কাঁঠালী বুদ্ধিজীবীরা জানে না। মিছিলে অনেক নতুন মুখ। বুদ্ধিজীবী হবার রিহার্সাল। এরা সব ভাবীকালের বুদ্ধিজীবী। অকালেরও হতে পারে। গ্রীষ্মের কচি ভেন্ডির মতো সব লকলকে বুদ্ধিজীবী।

বুদ্ধিজীবী কারা এ নিয়ে আগে বিতর্ক ছিল, এখন আর নেই। কয়েকদিন আগে আমার ইস্কুলের কমনরুমে বুদ্ধিজীবী কারা এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল। তুমুল বিতর্ক। বাড়িতে এসে সে কথা বলতেই অবাক হয় আমার ছেলে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সে বলে এই নিয়ে তোমরা ঝগড়া করো। আমি জানি। বুদ্ধিজীবী কাদের বলে তাও জানি। খুব একটা পাত্তা দিলাম না। সে বলেই চলে। ওইতো মাঝে মাঝে যারা কলকাতার রাস্তায় হাঁটে তারাই বুদ্ধিজীবী। সার্থক সংজ্ঞা। পেয়ে গেছি। আর বিতর্ক নেই, শখ করে যারা কখনও-সখনও কলকাতার রাস্তায় হাঁটে তারাই বুদ্ধিজীবী। ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়কে যদি কেউ 'হাঁটুজীবী' বলেন তবে অবাক হবার কিছু নেই।

এক বছর আগেও কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। বামবুদ্ধিজীবী আর ডানবুদ্ধিজীবী। বামবুদ্ধিজীবীরা এখন সেঁটে গেছেন। তাদের অবস্থা এখন বাজারের বাসি সবজির মতো। মাঝে মাঝে জলের ছিটে দিয়ে টিকিয়ে রাখা।

ডানপন্থীবুদ্ধিজীবীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। আগে সুনন্দ, কবীর সুমন, কৌশিক, অর্পিতা শুভাপ্রসন্ন সব এক গোয়ালে ছিলেন। সে দলে ব্রাত্যও ছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের দল থেকে ব্রাত্য এখন ব্রাত্য। বাকিরা ভাগ হয়ে গেছেন। সিপিএমের পতনের আগে বামবুদ্ধিজীবীরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের দুটি ভাগ ছিল— দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী আর ধান্ধামূলক বস্তুবাদী। এখন ডানপন্থীরাও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন।

সুমন, কৌশিক, সুনন্দ এদের নেতৃত্বে একদল। অন্যদিকে অর্পিতা, শুভাপ্রসন্ন এদের নেতৃত্বে আর এক দল। দিদি ক্ষমতায় আসার পর শুভাপ্রসন্ন কোনও ছবি এঁকেছেন কিনা, অথবা অর্পিতা কোনও নাটক করেছেন কিনা জানা নেই। তবে দুজনেই এখন সরকারি প্রসাদধন্য। এঁরা দিদিকে দেখছেন। গিভ অ্যান্ড টেক পলেসি। চলছে চলবে। মাঝে থেকে ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন সমীর আইচ। চিত্রশিল্পী। তিনি এখন শুধুই বিনি পয়সার বাইট বিশেষজ্ঞ। তাঁর অবস্থা না ঘরকা না ঘাটকা। তিনি কোন দলেই নেই। তিনি এখন শুধুই বাইট বিশেষজ্ঞ। অর্পিতা, শুভাপ্রসন্নরা সরকারি প্রসাদ পেয়েছেন। তিনি তাও পাননি। অথবা হয়তো চাননি।

কলকাতার এইসব মোমবাতিমার্কা বুদ্ধিজীবীদের ধারণা তাঁরা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন। খণ্ডিত বঙ্গের তাঁরা নিয়ামক। রঙ মেখে নাটক করা অথবা ফুটপাতে বসে ছবি এঁকে যে পশ্চিমবঙ্গকে পাল্টানো যায় না তা এরা বোঝেন না। এঁদের ধারণা ধর্মতলার মেট্রোচ্যানেলে শান্তি চাইলে পশ্চিমবঙ্গে ঝরঝর করে শান্তির বার্তা নামবে। এরা মনে করেন পার্কস্ট্রিটের রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে হাঁটলে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরবে। এদের স্বপ্ন, গলায় গীটার ঝুলিয়ে শান্তি শান্তি বলে চেঁচালে শান্তি আসবে। চরম এবং চূড়ান্ত মুর্খামির নামান্তর। দক্ষিণ চব্বিশপরগণার গ্রামেগঞ্জের ভয়ঙ্কর উত্তাপ এঁদের অজানা। বীরভূমের নিত্যদিনের বোমার শব্দ এঁদের কানে যায় না। মালদহ মুর্শিদাবাদের নিত্য গোলাগুলি এঁদের অজানা। মাঝরাতের ধর্ষণ নিয়ে হল্লা হয় কলকাতায়। এই সব বুদ্ধিজীবীরা এমন করলেন যেন পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ এই প্রথম। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলির গ্রামগুলিতে ধর্ষণ নিত্যঘটনা। আকছার হয় মেয়ে পাচার। এগুলো সাজানো ঘটনা নয়। চরম বাস্তব। এ নিয়ে মুখ খোলেন না বুদ্ধিজীবীরা।

গত এক বছরে গোটা রাজ্যকে বারুদের স্তূপের উপর দাঁড় করিয়েছেন মমতা। ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। বুদ্ধিজীবীরা জানেন। কিন্তু কেউ মুখ খুলবেন না। সরকারি কোষাগার থেকে ইমামদের বেতন এক চরম অন্যায়। রাজ্যকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেওয়া। বুদ্ধিজীবীরা সব জানেন। কিন্তু কেউ মুখ খুলবেন না। কেউ সাহস করে বলবেন না এটা সংবিধান বিরোধী। পৃথিবীর কোনও মুসলিম রাষ্ট্রও ইমামদের বেতন দেয় না। এটা রাষ্ট্রবিরোধী, সংবিধানবিরোধী। দুর্বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধি দিয়ে এর ভয়ঙ্কর পরিণতিটা বুঝতে চাইছেন না। এ নিয়ে কোনও তর্ক-বিতর্ক হয় না। সাহসে কুলোয় না। এঁদের চিন্তা আছে। কিন্তু চেতনা নেই। এঁরা এক কল্পনার স্বর্গে বাস করেন।

কলকাতার এইসব বুদ্ধিজীবী বিবেকানন্দের গল্পের কুয়োর ব্যাঙের মতো। বদ্ধ চিন্তা। অথচ সবজান্তার ভান। এঁদের প্রত্যেকের ধারণা এঁরা সব বোঝেন। সাধারণ মানুষ বোঝে এঁদের যাবতীয় আস্ফালন কলকাতার রাস্তায় আর টিভির পর্দায়। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এঁদের চেনে না জানে না। পাত্তাও দেয় না। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে এঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। একথা সার বুঝেছেন দিদি। তাই তিনি এঁদের পাত্তা দেন না। এরা কি বললেন তা নিয়ে মাথাও ঘামান না। কিছুদিন আগেই প্রকাশ্য সভায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দিদি এঁদের নেড়িকুত্তা বলেছেন। তবু এঁদের চেতনা নেই। কারণ একদল পা-চাটা কুত্তা আর একদল বে-পাড়ার কুত্তা। দিদি জানেন এরা দূর থেকে চেঁচাতে পারে কিন্তু কিছু করতে পারে না।

কলকাতার সাংবাদিক নামধারী বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা আরও করুণ। সাংবাদিক, দালাল আর মস্তানের পার্থক্য মুছে গেছে। সব মিলেমিশে একাকার। কে দালালি করেন আর কে সাংবাদিকতা করছেন বোঝা যায় না। কে কখন কার দিকে ঢলছেন তাও স্পষ্ট নেয়। কোনটা সত্যি বলছেন আর কোনটা মিথ্যা বলছেন তাও ঠিক বোঝা যায় না। এঁদের বুদ্ধির ফাঁপা কলসী তুড়ি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছেন দিদি। বুঝিয়ে দিয়েছেন তথাকথিত বিখ্যাত সব মিডিয়াকে পাত্তা না দিলেও কিছু যায় আসে না। এতদিন লোকে যাদের সিংহ ভাবতো সেই সব মিডিয়া যে নেহাতই সিংহের ছাল পড়া গাধা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিদি। সুতরাং কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে রাস্তা হাঁটবেন। অবশ্যই রোদ এড়িয়ে। নাচবেন, গাইবেন, কিন্তু তাতে কারও কিছু যায় আসে না। তবে আগামী প্রজন্ম এঁদের বুদ্ধি নিয়ে যে প্রশ্ন তুলবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবার কেন্দ্র বাংলাদেশ : লক্ষ্য মোগলস্তান

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান তৈরির ৬৫ বছর পরেও কট্টরপন্থী মুসলমানদের উদ্যম-উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি। প্রতিদিনই নতুন নতুন ষড়যন্ত্র রচনা করা চলছে খণ্ডিত বর্তমান ভারতকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ছেঁটে ফেলার। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে যতই সম্পর্ক খারাপ হোক না কেন অখণ্ড ভারতে বসবাসকারী (ভারত-বাংলাদেশ- পাকিস্তান) তাবৎ কট্টরপন্থী মুসলমানদের একটাই লক্ষ্য বা স্বপ্ন— অবশিষ্ট ভারতবর্ষকে মোগলস্তান বা মুসলিমস্তানে পরিণত করা। এজন্য আল কায়েদা সহ তাবৎ ইসলামী কট্টরপন্থী সংগঠন একযোগে সক্রিয়। তাদেরকে একযোগে এমনভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যাতে সারা ভারতই ইসলামী পতাকার পদতলে আসে।

পৃথিবীতে ইসলাম-কে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে হয় তাহলে তথাকথিত ভারতীয় উপমহাদেশের গোটা এলাকাটাকেই ইসলামীকরণ করতে হবে। ওসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সক্রিয় হওয়া এবং ওই ক্ষেত্রে সেনা ব্যারাকের আদলে জেহাদিদের শিবির শুরু করা সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। সেজন্যই ভারতে দাউদ ইব্রাহিম, লস্কর এ তৈবা, জৈশ এ মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন এবং জামায়েত এ ইসলামীর মতো সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জেহাদিরা এজন্য বাংলাদেশকে নিজকেন্দ্রে পরিণত করেছে। তাদের অভিমত হলো, ভারতের সীমানার চারদিকেই বাংলাদেশ। ফলে অনুপ্রবেশ করে বৈশ্বিক মুসলিম শক্তির ওই নির্দেশকে কার্যকর করা বাংলাদেশ থেকেই সম্ভব। সেজন্য বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর স্থিত 'মোগলস্তান রিসার্চ ইনস্‌স্টিটিউট'-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং বাংলাদেশী গুপ্তচর সংস্থা ডি জি এফ আই ওই ইন্সটিটিউটকে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাকে নিয়ে এক ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। মানচিত্রে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান একসঙ্গে মিলে গিয়েছে। তবে এই মানচিত্র একেবারে ভিন্ন আকৃতির।

ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য এই পরিকল্পনা করেছিলেন প্রয়াত পাক সেনাপ্রধান ও পরে রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল জিয়া উল হক। তাঁর আমলেই ওই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। জুলফিকার আলি ভুট্টোর সময়েই পাকিস্তান থেকে কেটে গিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। ফলে পাক-সেনা ও পাক-জনতা হীনমন্যতায় ভুগছিল। সেটা কাটাবার জন্যই ওই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

ভয়াবহ পরিকল্পনা :

প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাটা বহু পুরাতন। কিন্তু তাকে কার্যকর করার জন্য প্রাণবায়ু সঞ্চার করা হয় জিয়াউল হকের সময়ে। ভারতে সক্রিয় জেহাদিদের আরও মজবুত করার জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হতে থাকে। যোজনার সূত্রধারদের বক্তব্য— ভারতে লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামীকরণের গতি কমে যায়। যদি পৃথিবীতে ইসলাম-কে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে হয় তাহলে তথাকথিত ভারতীয় উপমহাদেশের গোটা এলাকাটাকেই ইসলামীকরণ করতে হবে। ওসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সক্রিয় হওয়া এবং ওই ক্ষেত্রে সেনা ব্যারাকের আদলে জেহাদিদের শিবির শুরু করা সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। সেজন্যই ভারতে দাউদ ইব্রাহিম, লস্কর এ তৈবা, জৈশ এ মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন এবং জামায়েত এ ইসলামীর মতো সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদের সকলের মনোবাসনা হলো ভারতবর্ষে এমন একটা দেশ তৈরি করা যেখানে মোগল সাম্রাজ্যের একটা স্পষ্ট ছবি দেখা যায়। কাজে লাগানো হয়েছে সিমি এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনকে--- জেহাদি কাজ-কারবার চালানো আর হিন্দুদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে হামলা করতে। 'লস্কর এ তৈবা' এই ইসলামী আন্দোলনের একটা অংশমাত্র। তারা কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছিল--- ''হিন্দুরা ইসলামের শত্রু। মুসলমান হও অথবা কচুকাটা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকো''। 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠা করাও সেই একই রণনীতির অঙ্গ। ভারতে লক্ষ্ণৌ, বেনারস, ফৈজাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুর এবং নিউ দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ এই একই উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য করা হয়েছে।

ওই পরিকল্পনা অনুসারে কাশ্মীর এবং অসমে ইসলামী শাসন চালু করার কথা বলা আছে। এজন্য যোজনাবদ্ধভাবে কাজ করার

বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'মোগলস্তান রিসার্চ ইন্সটিটিউট' থেকে প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে ভারতবর্ষের যে সকল শহরে ঘন মুসলমান বসতি রয়েছে সেখানে স্থানীয় মুসলমানরা যাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করে সে ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই যোজনা অনুসারে দিল্লী এবং মলের কোটলা থেকে উত্তরপ্রদেশের মুসলিমবহুল এলাকা— আগ্রা, আলিগড়, মীরাট, বিজনৌর, মুজফফরনগর, সাহারানপুর এবং মোরাদাবাদের মতো শহরকে ধরা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে মুসলমান ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। সেক্ষেত্রে ওদের মোট জনসংখ্যা কত হবে সেটা অনুমান করা যেতেই পারে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে অতি সম্প্রতি ইসলামের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও উৎসাহ কতখানি বেড়ে গিয়েছে। নেপালে সাম্প্রতিক অতীতে দু'বার মুসলমান সম্মেলন হয়েছে। ওই সম্মেলনে জেহাদ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও চর্চা হয়েছে। এর দূরগামী ফল অবশ্যই দৃশ্যমান হবে। ভারত-নেপাল সীমান্তে মসজিদ ও মাদ্রাসার জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাওয়াতে বা হঠাৎ করে একাজ করা হয়নি। সম্পূর্ণ যোজনাবদ্ধভাবেই করা হয়েছে। জেহাদ বিষয়ক এসকল কথাবার্তা কারও কারও অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে ভারত ও অন্যত্র মুসলমানরা যে জেহাদ এবং খিলাফতের জন্য উদগ্রীব— এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই ব্লু-প্রিন্ট-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন যে মুসলিমস্তান তৈরি হবে তার নাম হবে 'মোগলস্তান'। মোগলরা যেভাবে তরবারি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ভারতে ইসলামী পতাকা উড়িয়েছিল— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকেই নীতিগতভাবে অনুসরণ করে মোগলিস্তান-এর পরিকল্পনা রূপায়িত করবে। মোগলরা প্রথমে অস্ত্রবল এবং পরে নানারকম পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। যেই না সফল হয়েছে তখনই 'জিজিয়া' কর চালু করতে কোনও দ্বিধা করেনি।

মোগলস্তানের খোয়াব :

কট্টরপন্থীরা এই বিরাট পরিকল্পনার নাম দিয়েছে 'মোগলস্তান'। মোগলস্তান গবেষণা সংস্থা তাদের রিপোর্টে বলেছে— 'সেদিনের কথা মনে কর যেদিন বাবর ভারতে এসে মোগলস্তানের ভিত গেড়েছিল। ফরগনা থেকে আগত বাবর কিন্তু ফিরে গিয়েছিল। তার কবর রয়েছে কাবুলে। তবে তার ছেলেরা আর পিছন ফিরে দেখেনি। হুমায়ুন থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত যে নীতিতে শাসন করেছে তার ফলে হিন্দুদের এক বড় অংশকে শেষ করে দিয়েছে। এই এলাকায় ইসলাম এত দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করে যে, সারা দুনিয়া অবাক হয়ে দেখেছে। এতদিন পর্যন্ত বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা সফল হয়নি। কিন্তু মোগলরা সাহস দেখিয়েছে আর ভারতের একটা বিরাট এলাকা দখল করেছে। আমরা যাকে অখণ্ড ভারত বলি, তা তো মোগল আমলেই ছিল। সারা উত্তর ভারত দখলে। ভারতে ছোট-বড় রাজারা ওদের নামে ভয় পেত। সম্রাটরা যে নিয়ম-নীতি ঠিক করেছিলেন তা সেখানের সবাই মেনে নিয়েছিলেন। ইসলামের প্রসার এত তীব্রগতিতে আর কোথাও হয়নি। ইরানের পর ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যা দখল করার পর মুসলমানদের আধিপত্য বেড়ে গিয়েছিল। এজন্য নব-আকাঙ্ক্ষিত 'মোগলস্তান'-এর ষড়যন্ত্রকারীদের বক্তব্য হলো— 'আমাদের আদর্শ সেই ভারত যেখানে মোগলদের আদর্শ বিদ্যমান থাকবে, যে ভারতকে দখল করে ইসলামের জয়ডঙ্কা নিনাদিত হয়েছিল।'

সীমারেখা নির্দিষ্ট :

বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা নতুন মোগলস্তানের এক মানচিত্রও প্রকাশ করেছে। ভারতের কোন্ কোন্ এলাকা সহজে দখল করা যাবে আর কোথায় কোথায় লড়াই করতে হবে তাও বলা হয়েছে। কাশ্মীরের বিষয়ে বলা হয়েছে— ওখানে তো প্রায় একশ ভাগই মুসলমান। সেজন্য তা মোগলস্তানে ঢোকাতে কোনও অসুবিধা হবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংলগ্ন, ৯২ শতাংশ জনসংখ্যা মুসলমান। ওখানে পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে অনুপ্রবেশ সহজ। এজন্য তা মোগলস্তানে ঢোকাতে একটুও অসুবিধা হবে না। কাশ্মীরে এসময় অনেক জেহাদি গোষ্ঠীরা সক্রিয়। ওখানের মানুষও ভারত থেকে আলাদা হতে চায়। নেপাল সীমান্ত দক্ষিণে দুটো বড় প্রদেশের সঙ্গে ঠেকেছে। ওখানে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অবস্থিত। এখানের অনেক এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ওই এলাকায় মাদ্রাসার আধিপত্য রয়েছে। এজন্য মোগলস্তানের জন্য খুব বেশি লড়াই করতে হবে না। বিহার ও বাংলার যে সকল সীমান্ত এলাকা বাংলাদেশের সঙ্গে সংলগ্ন তা তো মুসলমান প্রধান এলাকা। বিভাজনের সময় ওই এলাকাটাকে পাকিস্তানে ঢোকানোর জন্য মুসলিম লীগ অনেক চেষ্টা করেছিল।

উত্তরপ্রদেশের নীচের এলাকায় অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান জনসংখ্যা ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ বলা হয়েছে। মজার কথা হলো— রাজস্থান, গুজরাটের দক্ষিণ ভাগ, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসংখ্যা অনেক কম বলা হয়েছে। এই সকল এলাকাকে 'মোগলস্তান'-এ অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন বলা হয়েছে। পুরো ক্ষেত্রকে কিভাবে মুসলমানবহুল করা যায় সেজন্য অনেক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মোগলস্তানের পরিকল্পনার আড়ালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অনেক মনগড়া তথ্য দিয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছা মিটিয়েছে। তবে তাদেরকে মনে রাখতে হবে— এখনও ভারতবর্ষের ৮৫ শতাংশ জনসংখ্যা (?) হিন্দু। এছাড়া বিদেশে বসবাসরত দু'কোটির মতো হিন্দু এই সকল ষড়যন্ত্র বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এজন্য মোগলস্তান বা মোগলস্তানের স্বপ্নটা মুঙ্গেরিলালের 'হাসিন' স্বপ্নের মতোই হতে পারে। জেহাদিদের আরও একটা দিক ভেবে দেখতে হবে যে, ভারতবর্ষে ৮০০ বছর রাজত্ব করার সময়েও তারা অনেক এলাকায় হিন্দবী সাম্রাজ্য, খালসা সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর হিন্দু সাম্রাজ্যকে জয় করতে পারেনি।

সেক্ষেত্রে আজকের বিশ্বে এক মহাশক্তি রূপে পরিগণিত ভারতবর্ষকে নিজেদের অধীনে আনার যে স্বপ্ন তারা দেখছে তা কখনও বাস্তবায়িত হবে না।

এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গড়ে তোলা এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে সরকার এবং জনসাধারণকে সাবধান তো থাকতেই হবে।

বহু ঢক্কানিনাদের ‘মনরেগা’য় ব্যাপক অনিয়ম উত্তরপ্রদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের বহু প্রচারিত এবং সফল বলে দাবী করা মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা ‘মনরেগা’-এর আওতাধীন প্রকল্পগুলি উত্তরপ্রদেশে একপ্রকার মুখ থুবড়ে পড়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ ক্ষিপ্ত। রাজ্যের জন্য বরাদ্দ চল্লিশ হাজার কোটি থেকে কমিয়ে ৩০ হাজার কোটি টাকা করে দেবেন বলে শ্রী রমেশ হুমকিও দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিশেষ কিছু করার নেই। পুরোটাই নির্ভর করে রাজ্য সরকার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর উপরে। এই কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দল রাজ্যের অনিয়মের কথা বলায় তা নিয়ে নড়েচড়ে বসছে। আগামী নভেম্বর মাসে সংসদে ‘মনরেগা’-র রাজ্যানুসারে বিধিবদ্ধ অডিট রিপোর্ট (পরীক্ষিত হিসাব) পেশ করবেন বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন। সূত্র মতে, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং ছত্তিশগড়— এই পাঁচটি রাজ্যের অডিট রিপোর্ট প্রথম দফায় সংসদে পেশ করা হবে। গত ১৩ মে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সি বি আই-কে ২০০৬-০৭ সালে উত্তরপ্রদেশের ছ’টি জেলার ১০০টি গ্রামে তহবিল-এর অপব্যবহার বিষয়ে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রমেশ সংসদে অন রেকর্ড তিনটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। বিহার, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশার কথাই বলেছেন। ওখানে আশানুরূপ তহবিল ব্যবহার হয়নি। তিনি রাজ্যসভায় বলেছেন— দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব সত্ত্বেও পূর্বভারতের তিনটি রাজ্যে অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত রাজ্যের তুলনায় একশ’ দিনের কাজের জন্য চাহিদা কম। ওই তিনটি

রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়াস হচ্ছে। কেননা পঞ্চায়েতই ‘মনরেগা’ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করে। এ বছরের ১ এপ্রিল থেকে সকল রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে মনরেগা’র কাজে দৈনিক মজুরীও বাড়ানো হয়েছে। পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স ফর এগ্রিকালচারাল লেবার-এর।

প্রতিবছরই এইভাবে ১ এপ্রিল মজুরি পুনর্বিবেচনা হবে।

শ্রী রমেশ বলেছেন, তাঁর মন্ত্রক এ বছরের অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রাজ্যের অডিট রিপোর্ট হাতে পাবে। সেখানে ২০০৭ থেকে ২০১১-এর সকল জমাখরচ থাকবে। এবছর থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর কাছ থেকে বিধিবদ্ধভাবে হিসাব পরীক্ষার প্রমাণপত্র নিতে হবে। এজন্য কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল জেলাস্তরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের প্যানেল তৈরি করবে বলে জানানো হয়েছে।

ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করছে আওয়ামি লিগ নেতারা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বিএনপি ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জায়গা-জমি, বাড়িঘর দখল করবে ওই দলের নেতারা, এই ভয় দেখিয়ে আওয়ামি লিগ নেতারা হিন্দুদের জায়গাজমি, জমিভিটা জোর করে অল্প দামে কখনও নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়ে তাদের ভারতে চলে যেতে বাধ্য করছেন। এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটছে। ভয়ঙ্কর এই মানসিকতায় সর্বশেষ শিকার ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার সদর পৌর এলাকার আজিজ ফাজিলপুর গ্রামের জেলেবাড়ির ৬ হিন্দু পরিবার। এই ৬ পরিবারের ২২ সদস্যের সন্ধান মিলছে না। তাদের বাড়িতে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। শূন্য ঘর, আসবাবপত্র ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আশেপাশের লোকজন বলছেন, ১৫ মে সকাল থেকে তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাদের সর্বশেষ দেখা গেছে ১৪ মে সন্ধ্যায়।

সুনীল চন্দ্র দাস, বাবুল চন্দ্র দাস, শ্রীদাম চন্দ্র দাস, নির্মল চন্দ্র দাস, দুলাল চন্দ্র দাস ও মনোহরণ দাস কেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছেন তার কোনও সন্তোষজনক জবাবও মিলছে না প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। এ নিয়ে গোটা হিন্দু পাড়ায় ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলছেন সম্পত্তি গ্রাস করতে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাদের জোর করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, তাদের হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দাগনভূঞা থানার পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছেন, বলছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ‘নিখোঁজ’ একজনের সঙ্গে পুলিশ সুপারের যোগাযোগ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তিনি নাকি জানিয়েছেন, তারা ফেনীতেই আছেন। ফেনীতেই বসবাস করবেন। ৬টি হিন্দু পরিবারের ২২ সদস্য নিখোঁজ হয়ে গেলেও পুলিশ প্রথমে ঘটনাটির ওপর কোনও গুরুত্বই দিতে চায়নি, যেন এ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু হলে দাগনভূঞা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার কয়েকজন জানান, ওই পরিবারগুলোর জমিজমার ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আওয়ামি লিগ নেতাদের। সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে তাদের বাড়িভিটা ও জায়গাজমি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে। এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও ভয়ভীতির মধ্যে ছিল পরিবারগুলো। শেষ পর্যন্ত আওয়ামি লিগ নেতাদের হাতে পৈতৃক ভিটে ও জায়গাজমি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে ৬ হিন্দু পরিবার। আরও খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই ৬ পরিবারের সম্পত্তি গ্রাস করার পর ওই আওয়ামি লিগ নেতারা এলাকার আরও কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এদের সম্পত্তি গ্রাসেরও পক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

দাগনভূঞা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ১৪ মে সুনীল চন্দ্র দাস, বাবুল চন্দ্র দাস, শ্রীদাম চন্দ্র দাস, নির্মল চন্দ্র দাস, দুলাল চন্দ্র দাস ও মনোহরণ দাস বাড়ি, ভিটা ও জমিজমা সমেত ১০৩ শতাংশ সম্পত্তি আমমোক্তারনামা দলিলমূলে (দলিল নম্বর ২৮১১) তিন ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু সম্পত্তির কোনও মূল্য দেখানো হয়নি। ওই সম্পত্তির ক্রেতারা হচ্ছেন বেলায়েত উল্লাহ, দিদারুল কবীর ও জাহিরউদ্দিন মাহমুদ। তারা সবাই আওয়ামি লিগ নেতা। এদের অন্যতম বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান দিদারুল কবীর জানিয়েছেন, এ সম্পত্তি দখলের জন্য বিএনপির কিছু লোক চেষ্টা করছিল। ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে ওই সম্পত্তি দখল করতে পারে, এই আশংকায় ছয় পরিবার সম্পত্তি বিক্রি করে স্বেচ্ছায় চলে গেছে। দিদারুলের দাবি, তারা ফেনীর কোথাও রয়েছে, নিখোঁজ হয়নি। দিদারুল আরও জানান, বাড়ি, ভিটা ও জমি তারা এক কোটি ১৫ লাখ টাকায় কিনেছেন। ওই জমির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। বেলায়েতও জানিয়েছেন, তারা ওই জমি কিনে নিয়েছেন। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কিছু লোক এবং বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা অভিযোগ করেছেন, ওই ছ'টি পরিবার তাদের বাড়ি-ভিটা ও জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাড়িভিটে ও জায়গাজমি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে তারা জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েই চলে যায়। যে টাকার কথা বলা হচ্ছে তা পরিবারগুলো পায়নি। কিছুদিন আগে সাতক্ষীরায় চাকদাহ বসন্তপুর গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর পর সেখানে গিয়ে জানা যায়, গত তিন বছরে এই গ্রাম থেকে কয়েক ডজন হিন্দু পরিবার জায়গাজমি বিক্রি করে ভারতে চলে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাড়িভিটে-জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। অনেকটা জলের দরে তারা বাড়িঘর ও জায়গাজমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর এই সম্পত্তি কিনছেন আওয়ামি লিগ, বিএনপি ও জামায়াত-এ ইসলামির নেতারা। জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে যত মতপার্থক্য থাকুক হিন্দু সম্পত্তি গ্রাসে তাদের ঐক্য লক্ষ্যণীয়। সাম্প্রতিক সময়ে এই ধরনের তৎপরতা আরও বেড়ে গেছে। এভাবে সম্পত্তি দখলের খবর পাওয়া গেছে হিন্দু অধ্যুষিত ফরিদপুর, গোপালগঞ্জসহ আরও কয়েকটি জেলা থেকে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে অসম সরকার ১০ মাসে খরচ করেছে মাত্র ৪৪ শতাংশ

সংবাদদাতা ॥ দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অসম সরকার জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের কাছে (National Development Council)- সম্ভাব্য ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য পেশ করেছে। তার পরিমাণ হলো ৯৮,০০০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, অসম থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহই ওই এন ডি সি-র চেয়ারম্যান। রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের সূত্রে উপরোক্ত সংবাদ জানা গেছে। এবারের পরিকল্পনায় কৃষিতে সংস্কারের জন্য বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার পানীয় জল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায়ও জোর দিচ্ছে।

তবে এন ডি সি দ্বাদশ পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তার উপর জোর দিতে চাইছে। সূত্রমতে জুন মাসের শেষে অথবা জুলাই মাসের শুরুতে অসম সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের এক বৈঠক হবে। সেই বৈঠকেই রাজ্য দ্বাদশ পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্র থেকে কত টাকা পাবে তা জানা যাবে। ইতিমধ্যে গত ৫ জুন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররা এবং রাজ্যের পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে আগামী ২০১২-১৩ সালের প্রাপ্য অর্থের বিভিন্ন খাতে বিলিবন্টন বিষয়ে এক বৈঠক হয়েছে।

২০১১-১২-তে অসম সরকার ৯০০ কোটি টাকা পেয়েছিল। গত ১৪-১৫ মে দিল্লীতে অসমের অর্থদপ্তর ও পরিকল্পনা- উন্নয়ন দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের এক বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বরাদ্দ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ২০১১-১২ বছরে বরাদ্দ ৯০০০ কোটি টাকার ব্যবহার বিষয়ে অনেকরকম অভিযোগ উঠছে। ২০১২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য সরকার বরাদ্দের কেবলমাত্র ৪৪ শতাংশ অর্থ খরচ করতে পেরেছে। রাজ্য অর্থদপ্তর ২০১১-১২ অর্থবর্ষের প্রাপ্ত বরাদ্দের হিসাব দিতেই পারেনি। এমনও খবর যে, অসম রাজ্যের অর্থদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১১-১২-এর কোনও হিসাবই জমা করেনি। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৪৪ শতাংশ অর্থ খরচ হলে বাকি ৫৬ শতাংশ অর্থ মাত্র ছ'মাসে কীভাবে খরচ করা সম্ভব?

সাধারণত, বাজেট বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব দিলে পরবর্তী বছরের বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়।

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে...

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ তামে ওটানাবের বয়স ৭৩ বছর। যা দিনকাল পড়েছে তাতে তেইশেই বাত ধরে যাচ্ছে, তিয়াত্তর বছরে পঙ্গু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এখন তো ফ্ল্যাটের যুগ, আগেকার দিনের খাড়া সিঁড়ি হলে বাতগ্রস্তের কাছে তা স্বর্গের সিঁড়ি বইতো আর কিছু নয়। তবে ছোট ছোট পাদানীওলা ফ্ল্যাটের সিঁড়িই বা কম কিসে? বাতের রোগীর কাছে সে তো এভারেস্ট। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন তামে ওটানাবে এভারেস্ট জয় করেছেন। এই সেরেছে! শ্রীমতী ওটানাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দোরগোড়ায় পৌঁছেছেন ভেবেছেন নাকি? মোটেই না, সত্যিকারের ৮৮৪৮ মিটার উঁচু এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছেন তিনি। কি বললেন, লিফটে করে উঠেছেন? ছ্যা, ছ্যা; লিফটে করে উঠবেন কেন? একি ফ্ল্যাট বাড়ি পেয়েছেন নাকি! যে লিফটের ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে উঠে যাবেন? আরে বাবা, এ হলো খোদ হিমালয়। যাত্রাপথে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া নেহাৎ কম পোহাতে হয়নি। কি জিজ্ঞেস করলেন? বেতো রোগী অত উঁচুতে উঠল... এটা কি ঠাকুমা'র ঝুলি সিরিজের কোনও গল্প? আরে রামো! তামে ওটানাবের বাত হতে যাবে কোন দুঃখে? তবে কিনা তাঁর বয়স ৭৩ বছর। আর এই বয়েসটা যে বাতে পঙ্গু হবার তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী ওটানাবে অবশ্যই ব্যতিক্রম। গত ১৯ মে বিশ্বের প্রবীণতমা ভদ্রমহিলা হিসেবে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহন করলেন তিনি। ইতিপূর্বে এই রেকর্ডটি ছিল পোল্যান্ডের আন্না কেজেরউইনস্কা-র। তিনি ৫০ বছর বয়েসে এভারেস্টে উঠেছিলেন। ওটানাবের সঙ্গে কেজেরউইনস্কা-র বয়সের এই দুস্তর ব্যবধানই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শ্রীমতী তামে ওটানাবের কৃতিত্ব কতখানি বেশী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মীন বাহাদুর শেরচেনের নাম। নেপালী এই বৃদ্ধটি 'মাত্র' ৭৬ বছর বয়সে বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ হিসেবে সর্বোচ্চ এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহন করে নজির গড়েছেন।

শৃঙ্গারোহনের মাস খানেক আগে থেকেই কাঠমাণ্ডুকে ঘাঁটি গেড়েছিলেন ইয়েমেনীয় বংশোদ্ভূত, বর্তমানে জাপানের অধিবাসী এই মহিলা ও তাঁর দলবল। দলবল বলতে চারজনের দল, আর এই দলে অন্যতম জাপানী পর্বতারোহী এবং চিত্রগ্রাহক নোরিয়ুকি মুরাগুচি। গত ১৮ মে রাত্রে তাঁরা তাঁদের সর্বোচ্চ উচ্চতার (৮৩০০ মিটার) তাঁবুতে পৌঁছোন এবং সারারাত ধরে পর্বতারোহন করেন। তারও দিন চারেক আগে এঁরা এভারেস্ট শৃঙ্গে পৌঁছে যেতে পারতেন যদি না প্রকৃতি বাদ সাধত। প্রকৃতির বাদ সাধার জন্যই তাঁরা দু'বার পরিকল্পনা পাল্টাতে বাধ্য হন। বাজে আবহাওয়ার জন্য অনেক পর্বতারোহী-ই এভারেস্ট ওঠার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার আগের সপ্তাহে।

প্রথম জাপানী মহিলা হিসেবে জুঙ্কো তাবেই এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন ১৯৭৫-এ। একথা সকলেরই জানা যে এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে ১৯৫৩-এ প্রথম হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট ওঠেন। তারপর প্রায় ৩০০০ পর্বতারোহী সেখানে পৌঁছেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন অন্ধ রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ১৩ বছরের এক আমেরিকান যাঁর একটি পা ছিল কৃত্রিম। মাউন্ট এভারেস্ট নিজেই এক বিস্ময়। আর সেই বিস্ময় প্রতিনিয়ত অনেক বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবে এভারেস্ট পাহাড়।

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(রে

মাত্র দুই মিনিটে (ক্ষী)র তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি কনৌজের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অধীনস্থ সাকেত মণ্ডলের অধীশ্বর মেঘসূত অযোধ্যাতে একটি সুদৃশ্য স্বর্ণচূড়াযুক্ত বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। বর্বর বাবরের নির্দেশে সেনাপতি মীর বাকী এই মন্দির ধ্বংস করে। সেই মন্দিরের মালমশলা নিয়েই নির্মাণ করে বাবরী মসজিদ।

এলাবাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ মামলায় লুঙ্গি পূজক মার্কসগ্রস্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইরফান হাবিবের সঙ্কেতে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের হয়ে চাকরের মতো মিথ্যা ও পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য দেয়। সেই ইতিহাস নিয়েই

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

রামজন্মভূমি-বাবরী মসজিদ মামলা

বাম শঠতার বৃত্তান্ত, ১৭০

তুহিনা প্রকাশনী।। ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। মো-৯৮৩০৫৩২৮৫৮।।

দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। মো-৯১৪৩৩৭৪০২৬।।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

জলাধার নির্মাণ

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে শুরু হয়েছে বনবাসী ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ। গত ২০০৯ সালে এই উদ্যোগের সূচনা হয় পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের শুশনিডি গ্রামে একটি জলাধার নির্মাণ করে। ২০১০-এ বীরভুম জেলার ময়ূরেশ্বর ব্লকের জেঠিয়া গ্রামে ১৪টি জলাধার নির্মাণ হয়। ২০১১ সালে বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের খুলেপাড়া গ্রামে তিনটি এবং বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ব্লকের গোবিন্দসোল গ্রামে ১টি জলাধার নির্মাণ হয়। এই বছর পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের কুসুমটিকারী গ্রামে ১০টি, সরাগড়া গ্রামে ৫টি, গঙ্গাডি গ্রামে ৪টি, ছোটপুঞ্চা গ্রামে ২টি, কেন্দাডি গ্রামে ২টি, মোট ২৩টি জলাধার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ব্লকের কলোপতি গ্রামে ২টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, আরও ৭টির নির্মাণ কাজ চলছে। জলাধারগুলি গড়ে ৩০'/৩০'/১০' জায়গা নিয়ে তৈরী হচ্ছে। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের গ্রাম বিকাশের কাজ হিসাবে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকল্প শুরু হয়েছে; যথা— (১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, (২) আকাশের বৃষ্টির অভাবের সময় কৃষি কাজে জলের যোগান, (৩) বন্যপ্রাণীর পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার, (৪) মাটির জলস্তর বৃদ্ধি করে গ্রামের কুয়োগুলিকে সজীব করা, (৫) মৎস্য চাষ। এইসব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য দায়িত্ব সহকারে কাজ করছেন খড়্গপুর আই আই টি'র ছাত্র এবং কল্যাণ আশ্রমের সদস্য নির্মল কুমার আগরওয়াল।

সমাবেশ সমাচার

পরলোকে ধূর্জটিপ্রসাদ পোদ্দার

বিদ্যাভারতী অনুমোদিত উত্তর মালদার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের সম্পাদক ধূর্জটিপ্রসাদ পোদ্দার গত ১৭ মে বিকালে মালদার এক বেসরকারি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার ক্যান্সারে ভুগছিলেন। কনুয়া হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন ধূর্জটিবাবু। আবাল্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। একসময় আর এস এসের মহকুমা শারীরিক প্রমুখ, জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান।

গত ৩১ মে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধানুষ্ঠান'। পরিবেশনায় সোসাইটির শিশু বিভাগ। পরিচালনায় ছিলেন বন্দনা দাস। ছবি : শিবু ঘোষ

ভারত বন্‌ধ ও তারপর

শ্যামল কুমার হাতি

গত ৩১ মে এন ডি এ-র ডাকে 'ভারত বন্‌ধ' সফল হয়েছে। পেট্রোলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে। সঠিক সময়েই এন ডি এ দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সাধারণ মানুষও তাদের সমর্থন করেছে। কার্যত কংগ্রেস একঘরে হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা ভীত। ইউ পি এ-র শরিক টি এম সি এবং ডি এম কে-ও এই ইস্যুতে রাস্তায় নেমেছে। যদিও এছাড়া তাদের আর উপায় নেই। টি এম সি-র ভয় রাজ্যে যদি তারা আন্দোলন না করে তা হলে বিজেপি ও বামেরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। তাই চালাকি করে একটু রাস্তায় নামা। আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর ভোজসভায় ভোজ খেয়ে পরের দিন রাস্তায় নামা এবং দিল্লীর সরকারের সঙ্গে থাকা কেমন কথা? এ যেন 'আমার যেমন বেণী তেমন রবে আমি চুল ভেজাবো না।' মুখে যাই বলুক মানুষ সব দেখছে। ডি এম কে-র ভয় এ আই ডি এম কে নিয়ে, ওরা তো সমর্থন তুলে নেওয়ার কথা বলেও আবার ডিগবাজী খেল। গতকাল সমাজবাদী পার্টিও রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এলাহাবাদসহ রাজ্যের কয়েকটি স্থানে উত্তরপ্রদেশের শাসক সমাজবাদী পার্টি রেল রোকো করেছে, ওদেরও ভয় ইউ পি এ-র ডুবন্ত জাহাজের উপর শুধু নির্ভর করে থাকা বোকামি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মুলায়মের সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে দিল্লীর সরকার নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে। ওদের আর মেজদি টি এম সি-কে খুব একটা দরকার নেই। তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ভীষণ রাগ ওদের উপর। সেইজন্যই গতকালের জৌনপুরের কাছে দুন এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পিছনে তিনি অন্যকিছুর গন্ধ পাচ্ছেন। যাই হোক, সময় সব কিছুই বলে দেবে। ওঁর তো এখন অনেক কিছুর উদয় হয়েছে মনে। উনি ধর্মঘট করতে দেবেন না। উনি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকে এখন চুপ থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। ওঁর গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলে "শাসক দল যা বলে তাই শোন। ওরা যদি চায় তবেই কথা বলো নচেৎ নয়।" আমি নিজেও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র। গণতন্ত্রের এমন কথা কখনও পড়িওনি বা শুনিওনি। আসলে ওঁর তো এখন বোধোদয় হয়েছে। তবে বাংলার মানুষ ভোলেনি কয়েক বছর আগে এম এল এ হোস্টেলে এক এম এল এ-র মৃত্যুর জন্য তিনি 'বাংলা বন্‌ধ' ডেকে ছিলেন। এখন সেই তিনিই চাইছেন দাম বাড়ুক, দুর্নীতি হোক, কেলেঙ্কারী হোক—আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না। যারা ভাবেন উনি সিপিএমের তীব্র বিরোধী তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, মাত্র কয়েক দিন আগে কেরলের সিপিএম নেতা এম এম মানি স্বীকার করেছেন যে সিপিএম খুনের রাজনীতি করে। তারা ওদের বিরোধীদের হিটলিস্ট বানিয়ে হত্যা করে। ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গেই কথাগুলো বলেছেন। বিজেপি কংগ্রেস তার বিরোধিতা করেছে। নরেন্দ্র মোদীও তীব্র সমালোচনা করেছেন। কই 'দিদি' তো কিছু বলেননি। দিদি বলেননি বলে রেলের দাদাও বলেননি। কেন বন্ধু? কেন দিদি চুপ। ওই দিদিই

বন্‌ধের দিন কর্মব্যস্ত সময়ে গড়ের মাঠ শিয়ালদহ স্টেশন। সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া।

> **"এই সরকার সবচেয়ে দুর্নীতিতে ডুবে থাকা সরকার। তার জন্যই সব কিছুতেই ভরাডুবি। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ওরা বলছে এন ডি এ-র সময়ে চব্বিশ বার দাম বেড়েছিল। আমরা জানি তা ঠিক। কিন্তু তখন কত বাড়ত? ১৯ পয়সা, ৩১ পয়সা, ৬২ পয়সা, আবার কয়েকবার অল্প বিস্তর কমেও ছিল। আর এখন? বাড়ছে তো বাড়ছেই—৩ টাকা, ৪ টাকা, সাড়ে সাত টাকা।"**

তো ৩০ তারিখে রাইটার্সে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বিজেপির বনধে সিপিএমরা বিজেপি সেজে রাস্তায় আনবে। এ যেন যাত্রাপালা! মনে হয় দিদি কয়েকদিন সংবাদপত্র পড়েননি। না হলে কি উনি চুপ থাকতে পারেন? কি বলুন!

দিদির একবছর, ইউ পি এ-২-এর তিনবছরে মানুষের মাথার চুল খাড়া হয়েছে। কংগ্রেসের লোকেরা বোকার মতো বলছে, টাকার দাম কমে গেছে তাই দাম বাড়ছে। জিডিপি গত ৯ বছরের তুলনায় কমেছে এবং সরকার তা স্বীকারও করে নিয়েছে। কেন্দ্রে যারা সরকারে রয়েছে এটা তো তাদের কাজ। কংগ্রেসের কাছে তো বিলেতে পড়া ৩ জন অর্থনীতিবিদ আছেন। তাঁরা কি করছেন? তাঁদের একজন তো প্রধানমন্ত্রী। ওঁদের কত গর্ব ছিল! এন ডি এ-র পরাজয়ের পর কংগ্রেসীরা বুকের ছাতি কত চওড়া করে বলেছিল, ''এবার সব সমস্যার সমাধান হবে।'' আর এখন তাঁরা কি বলছেন, ''জোট-রাজনীতির বাধ্যবাধকতার জন্য এই অবস্থা।'' এক বারের জন্যও বলছে না এই সরকার সবচেয়ে দুর্নীতিতে ডুবে থাকা সরকার। তার জন্যই সব কিছুতেই ভরাডুবি। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ওরা বলছে এন ডি এ-র সময়ে চব্বিশ বার দাম বেড়েছিল। আমরা জানি তা ঠিক। কিন্তু তখন কত বাড়ত? ১৯ পয়সা, ৩১ পয়সা, ৬২ পয়সা, আবার কয়েকবার অল্প বিস্তর কমেও ছিল। আর এখন? বাড়ছে তো বাড়ছেই— ৩ টাকা, ৪ টাকা, সাড়ে সাত টাকা। ওরা কি ভাবে মানুষের পকেটে ট্যাঁকশাল আছে? যা চাইবে মানুষ তাই দিয়ে দেবে? পেট্রোল যা ব্যবহার হয় তার সিংহভাগই হয় টু-হুইলারে ব্যবহার। বিভিন্ন সংস্থায় পিয়ন বা সাবস্টাফ শ্রেণীর কর্মচারীরা টু হুইলার কেনার জন্য লোন পায়। ছাত্র-ছাত্রীরা টু-হুইলার চড়ে কলেজে যায়। এদের পকেট কাটতে মায়া হয় না? এরপর যদি তারা প্রতিবাদ করে বন্ধ করে তখন সরকার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন— ধর্মঘট করলে ব্যবস্থা নেব! যত দমন-পীড়ন হবে ততই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হবে। কেউ এটা চায় না। এখন সরকারেরও ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আমাদের অফিসে একজন অফিসার বিল পাশ করতেন। তিনি সবার বিলই কাট-ছাঁট করতেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করতে বলেই ফেললেন 'আমার হাতে কাট-ছাঁটের ক্ষমতা আছে আমি তাই করি।' আমাদের সরকারের হাতেও ক্ষমতা আছে। তবে তার যথার্থ ব্যবহার করাই উচিত।

দেশের যা অবস্থা তাতে ইউপিএ সরকারের উপর মানুষের আর আস্থা নেই। এখন দেশের লোকের নজর এন ডি এ-র উপর। মানুষ এখন পথে ঘাটে, হাঁটে বাজারে বলছে এন ডি এ-ই ভাল ছিল। এটাকেই এনক্যাশ করতে হবে। এন ডি এ-র প্রধান ঘটক দল বিজেপি। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। বিজেপি-কেই এখন নিজের মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। আগামী নির্বাচনে অনেক দল মিলিয়ে সংখ্যা জোগাড়ের বদলে বিজেপি-কে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে আজকের নির্বাচকমণ্ডলী দেশ বিভাজন কাদের জন্য হয়েছিল, কাদের রক্তে লাল হয়েছিল পদ্মা নদী, তা সব ভুলে গেছে। এখন দলে নতুন জোয়ার আনতে হবে। অতীতকে মনে রেখে চোয়াল শক্ত করে হাতের মুষ্ঠি শক্ত করে বর্তমানের উপর দাঁড়াতে হবে। মানুষের প্রকৃত দুঃখ খুঁজে পাশে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মাটি এখন তৈরী। ৩৪ বছর বামেদের শাসনে অনেক পাঁক জমেছে। এই পাঁকেই পদ্ম ফোটাতে হবে। আগাছার মধ্যে ঘাস ফুল ফুটলেও পাঁকে অচিরে পদ্ম ফুটবে। এবার আর ডিফেন্সিভ গেম নয়। অল্ আউট গেম খেলতে হবে। এবার সবাইকে নিয়ে চলার মধ্য দিয়েই তা হোক। দেশের মানুষ এই দৃশ্য দেখার জন্য মুখিয়ে আছে।

সফল বন্‌ধ। বনধের দিনে শুনশান ধর্মতলা চত্বর। সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — সঃ স্বঃ

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
Regd. Trade Mark
দুলালের তালমিছরি
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

খেলা

বহির্বিশ্বে ভারত-ঐতিহ্যের প্রতিভূ বিশ্বনাথন আনন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ যে নব ভারতের গরিমামণ্ডিত অবস্থানের কথা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রূপকল্পই যেন উঠে এসেছে বিশ্বনাথন আনন্দের বিশ্বকেতনের জয়ধ্বজায়। সারা দুনিয়া জয় করে ফেললেন একাধিকবার, তবু মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। নিজেকে জীবনের চেয়ে বড় ভাবা, প্রাতিষ্ঠানিক সব রীতিনীতিকে তুচ্ছ করা তাঁর ধাতে নেই। বরং সনাতন ভারতের বাঙ্ময় অভিব্যক্তিই ফুটে উঠেছিল তার চোখেমুখে, যখন সুপার চ্যালেঞ্জার বরিস গেলফান্ডকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো দাবার বিশ্ব খেতাব করায়ত্ত হয়েছে তার। এখন যেন দাবার আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে বিশ্বনাথন আনন্দের জীবনের দিকচক্রবাল এক মাত্রাবৃত্তে মিশে গেছে। এতকিছুর পরেও এদেশে তাঁর যথাযথ মর্যাদা ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিধা জুটল না। আসলে এখানে যে কর্তাভজা লবি না করলে কিছুই জোটে না। আর সংবাদমাধ্যমও যে ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কিছু বোঝে না। না হলে আদ্যন্ত পঙ্কিল আই পি এল নিয়ে এত বালখিল্য মাতামাতি করেন একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী! অথচ 'সন অব দ্য সয়েল' বা ১৬ জন জেনুইন ক্রিকেটার সম্বলিত দল মাস কয়েক আগে একদিনের রঞ্জি জিতেছে। পূর্বাঞ্চল প্রথমবারের মতো দলীপ জিতল, ৪-৫ জন বাংলা ক্রিকেটারের উৎকর্ষে। সেই দল নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সাঙ্গপাঙ্গোদের মধ্যে। আর এক বলিউডি নাচাগানাসর্বস্ব অভিনেতার টিম জুয়া খেলার নামান্তর আই পি এল জিততেই শহর কলকাতা জুড়ে উৎসবের ফোয়ারা ছুটিয়ে ছাড়লেন তিনি। যে দলে রাজ্যের তিনজন ছাড়া সব ভাড়াটে ক্রিকেটারে ভর্তি।

আসলে সমাজের সর্বস্তরে অধঃপতন ও অবক্ষয়। তার থেকে মন্ত্রী-আমলারাও বাদ থাকবেন কিভাবে! বিবেকানন্দের কথা মুখে বললেই নিজের জীবনাচরণের উত্তরণ হয় না। তাঁর চিন্তন ও চর্চাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। তাতে খানিকটা হলেও দেহ-মন-আত্মার উদ্বোধন তথা উত্তরণ হয়। সঠিক মানুষের মতো সমাজে নিজের অবস্থানকে প্রতিফলিত করা যায় নাহলে দিকভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত মানুষর মতো নড়বড়ে হয়ে বাঁচতে হয়। আনন্দ এর ব্যতিক্রম ও বৈদিক জীবনদর্শনকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছেন। তাই তিনি পৃথিবীর সবথেকে মহার্ঘ্য ক্রীড়া সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক দূত। ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের প্রকৃত ধারক। যে ঐতিহ্যকে স্বাধীনোত্তর ভারতে গুটিকয়েকজন মাত্র ধরে রাখতে পেরেছেন ও বিশ্বজনীন আবেদনে মূর্ত করেছেন। পৃথিবীর ১৮০টি দেশ দাবা খেলে। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার গ্র্যাণ্ডমাস্টার ও লাখের ওপর ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আজ ফিডের সদস্য। এই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাতাবরণে টানা বারো বছর বিশ্ব খেতাব ধরে রাখা কি সোজা কথা! ১৯৯৫, ১৯৯৮— দু'বার বিশ্বখেতাবী লড়াইয়ে নেমে শেষ ধাপটুকু উত্রোতে পারেননি আনন্দ। ১৯৯৫ সালে কাসপারভ, '৯৮-এ কারপভের বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছিল আনন্দের রণকৌশল। দুটো ফাইনালে পরাজয় থেকে নিজের দাবা থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা-চর্চার আমূল পরিবর্তন এনে এক নতুন দাবাড়ু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন আনন্দ। নতুন শতকের সূচনা পর্ব থেকেই নবতরঙ্গের হিরন্ময় উদ্ভাসে প্রদীপ্ত আনন্দ বিশ্বদাবার সবক'টি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ জয় করে নিলেন। সব ধরনের ফর্ম্যাটেই একাধিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ববি ফিশার, গ্যারি কাসপারভ বা অতীতের জোসরাউল কাপাব্লাঙ্কা, আলেকজাণ্ডার আলেথিনের সঙ্গে ঢুকে পড়েছেন 'হল অফ ফেমে'। তবে বিশ্বের সর্বকালীন কীর্তিখ্যাত সব দাবাড়ুর থেকে আনন্দের কৃতিত্ব গৌরব অনেক বেশি। ঠিকই বলেছেন সমসাময়িক গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ফিশার বা কাসপারভের থেকে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি হয়ে ভিসি যে উচ্চতায় উঠেছেন, যেসব সাফল্য ও কীর্তির অভিজ্ঞান রচনা করেছেন তার মূল্যায়ন করা উচিত প্রজ্ঞাদীপ্ত বিচার বিশ্লেষণে। প্রথম বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থিক-সামাজিক

সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তৈরি হয়েছেন ফিশার, কাসপারভরা। অন্যদিকে আনন্দ দুর্ভাগা ভারতবর্ষে থেকে নিজের প্রাথমিক স্কুলিং করেছেন। একটু বড় হয়ে ফিলিপাইন্সে ইউজিন টোরের স্কুলে গেছেন ও আধুনিক দাবার আঙ্গিকে নিজের চিন্তন-দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেখান থেকেই আনন্দের খেলায় পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাত্রা যোগ। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ মুন্সীয়ানায় আনন্দের জুড়ি মেলা ভার। ফরাসী কিংবদন্তী চলচিত্রকার জ্যা লুক গোদার দাবাভক্ত, আরও বেশি করে বললে আনন্দ-ভক্ত। গোদার বলেছিলেন আনন্দের ওপেনিং মিডল ও এন্ড গেমের উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা ও বহুমাত্রিক পরিশীলন দেখে মনে হয়, ও বোধহয় অন্য গ্রহের জীব। আর বৃটিশ ঔপন্যাসিক হেনরি বলডন তাঁর থিওরিটিক্যাল তত্ত্বের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও মিল খুঁজে পেয়েছেন। যে দর্শনের আধারে জারিত হয়ে আজ পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, ভারত সংস্কৃতির দূত হয়ে পাশ্চাত্যকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন, সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ কী! সেই পথের পথিক বিশ্বনাথন আনন্দ। মহাভারতীয় ঐতিহ্যসঞ্জাত দাবা ও যোগাসন যে বিশ্ব মানবসমাজের কাছে বেঁচে থাকা ও মহৎ কিছু করে দেখানোর আত্মা স্বরূপ। আর সেই সত্যেরই যে ঘনীভূত রূপ বিশ্বনাথন আনন্দ।

শব্দরূপ-৬২৯ অয়ন পাল

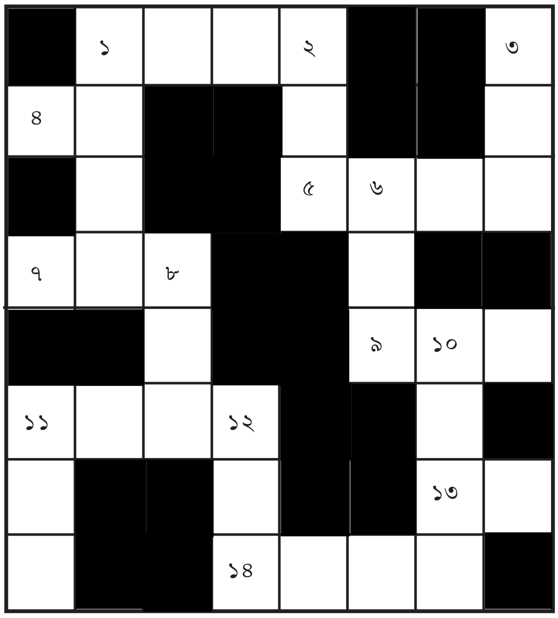

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** রামভক্ত মহাবীর বানর, এঁর মায়ের নাম অঞ্জনা, **৪.** মহাদেব, **৫.** রাম বনবাসকালে এই পর্বতে ভরতের সঙ্গে মিলন ঘটে, প্রথম দুয়ে ছবি, **৭.** তৎসম শব্দে বৎসর, অব্দ, একে-দুয়ে অব্যয়ে খেদ অনুতাপ শোক প্রভৃতি সূচক। **৯.** বিশেষণে পূজনীয়, প্রণম্য, **১১.** পাঁচটি মুখ বলে শিবের এই নাম, **১৩.** কালিকাদেবী, ব্যঙ্গার্থ কৃষ্ণবর্ণ নারী, **১৪.** জগন্নাথ ক্ষেত্র, আগাগোড়া বঙ্গীয় বু।

উপর-নীচ : **১.** বিশেষণে হোমের বস্তু, দুয়ে-চারে ইঙ্গ বালক, **২.** ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অসুর, এঁর পিতা কশ্যপ মাতা দনু, **৩.** পাণ্ডবরা অজ্ঞাত-বাসকালে এই রাজার রাজসভায় ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ছিল, শব্দার্থে বিশাল, **৬.** তৎসম ভয়, ত্রাস, ভীত হওয়া, **৮.** রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে এই নামে ডাকতেন, **১০.** শিবের রুদ্ররূপ, **১১.** তৎসম সমুদ্র, **১২.** দুহিতা সমার্থে স্বর্গের গোমাতা সুরভির কন্যা।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২৬

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ভ			স	ত্য	ভা	মা	
বা			চ্ছ		ণ্ডা		
নী	লা	চ	ল		রা	স	ভ
	খ					ত্যা	
	বা					গ্র	
মে	ন	কা		হ	রি	হ	র
		রি		ব			ক্তা
	পা	কা	ধা	ন			ঙ্গ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬২৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ জুলাই, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ ।। ২৬

চিত্রকথার এই সিরিজটি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ষ্টার থিয়েটারের ১২৫ বছর না ১৩০ বছর?

কলকাতা পুরসভার ভুল তথ্য পরিবেশন

বিকাশ ভট্টাচার্য।। গত ২৫ মে শনিবার কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে স্টার থিয়েটারের ১২৫ বছর পূর্তির স্মারক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সত্যিই কি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্টার থিয়েটারের এটা ১২৫ বছর? যে থিয়েটার নটী বিনোদিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ও অমৃতলাল মিত্র প্রমুখের তত্ত্বাবধানে, কলকাতার ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র বিনোদিনীর রূপমুগ্ধ গুর্মুখ রায়ের পঞ্চাশ হাজার টাকায় বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে ২১ জুলাই ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল, সেই থিয়েটারেরই কি ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হলো? যে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলা, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি নাটকের নাম জড়িত এবং যে স্টার থিয়েটার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিতে ধন্য— এ কি সেই স্টার থিয়েটার? এক কথায় বলতে হলে বলতে হয়— না। কারণ যে স্টার থিয়েটারের ১২৫ বছর পালিত হলো সেই স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ কোনওদিন পা রাখেননি। এমন কি নটী বিনোদিনীও কোনওদিন ওই মঞ্চে অভিনয় করেননি। যে স্টার থিয়েটারের ১২৫ বছর পালিত হলো সেটি— স্টার থিয়েটার (হাতীবাগান)। ৬৮, বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত মূল স্টার থিয়েটার গুর্মুখ রায় ছেড়ে দেবার পর পরবর্তী স্বত্বাধিকারীরা ভালোমতো চালাতে না পারায় ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল তা কিনে নেন এবং ওই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় এমারেল্ড থিয়েটার। কারণ স্টার কর্তৃপক্ষ বাড়িটি বেচলেও 'স্টার' নামের গুডউইল বেচেননি এবং পরবর্তীকালে ৭৫/৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে নতুন বাড়ি তৈরি করে ২৫ মে ১৮৮৮ শুক্রবার স্টার থিয়েটার, সাময়িক কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয় এবং গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক মঞ্চস্থ হয়। সুতরাং উৎসব করলে আগামী ২১ জুলাই ১৩০ বছর পূর্তি উৎসব হতে পারে, ১২৫ বছরপূর্তি নয়। কারণ, স্টার থিয়েটারের স্থান বদল হয়েছিল ২৫ মে ১৮৮৮। স্থান বদলের দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস বললে, বর্তমান স্টার থিয়েটারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও নটীবিনোদিনীর নাম জড়ানো যাবে না। কারণ এঁরা কেউই হাতিবাগান স্টার থিয়েটারে কোনওদিন পা রাখেননি। সেদিনের স্মারক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৩ সালের ১৫ অক্টোবর স্টারে প্রযোজিত হয় 'শ্যামলী'। নিরুপমা দেবীর ওই নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নির্দেশনায় ছিলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। এই নাটকে বোবা মেয়ের চরিত্রে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নায়ক উত্তমকুমার। এই নাটক একাদিক্রমে ২৬ মাস ধরে ৪৮৪ রাত্রি অভিনীত হয়ে সর্বকালীন অভিনয়ের এবং জনপ্রিয়তার রেকর্ড সৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে অভিনয়ে আরও ছিলেন সরযূবালা, জহর গাঙ্গোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ কুমার প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী।

সম্বর্ধনার উত্তরে আবেগপ্লুত সাবিত্রী দেবী ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নাটমঞ্চে সাতদিনই নাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রিয়া এন্টারপ্রাইসের হাত থেকে এবছর 'স্টার' কলকাতা পুরসভা গ্রহণ করে প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার নাট্যদলকে অভিনয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া শুরু করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ১২৫ বছর পর গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' মঞ্চস্থ করল 'হাওড়া সমাজ নদের নিমাই মন্দির'। পুরানো নাটকটি কিছুটা সম্পাদিত হয়েছে। তাতে নাটকটির অন্তর্নিহিত বক্তব্যে কোনও পরিবর্তন হয়নি। নাটক জুড়ে রয়েছে হরিভক্তির জয়গান। অনুষ্ঠানে নাটকের গান শোনালেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
11 June - 2012

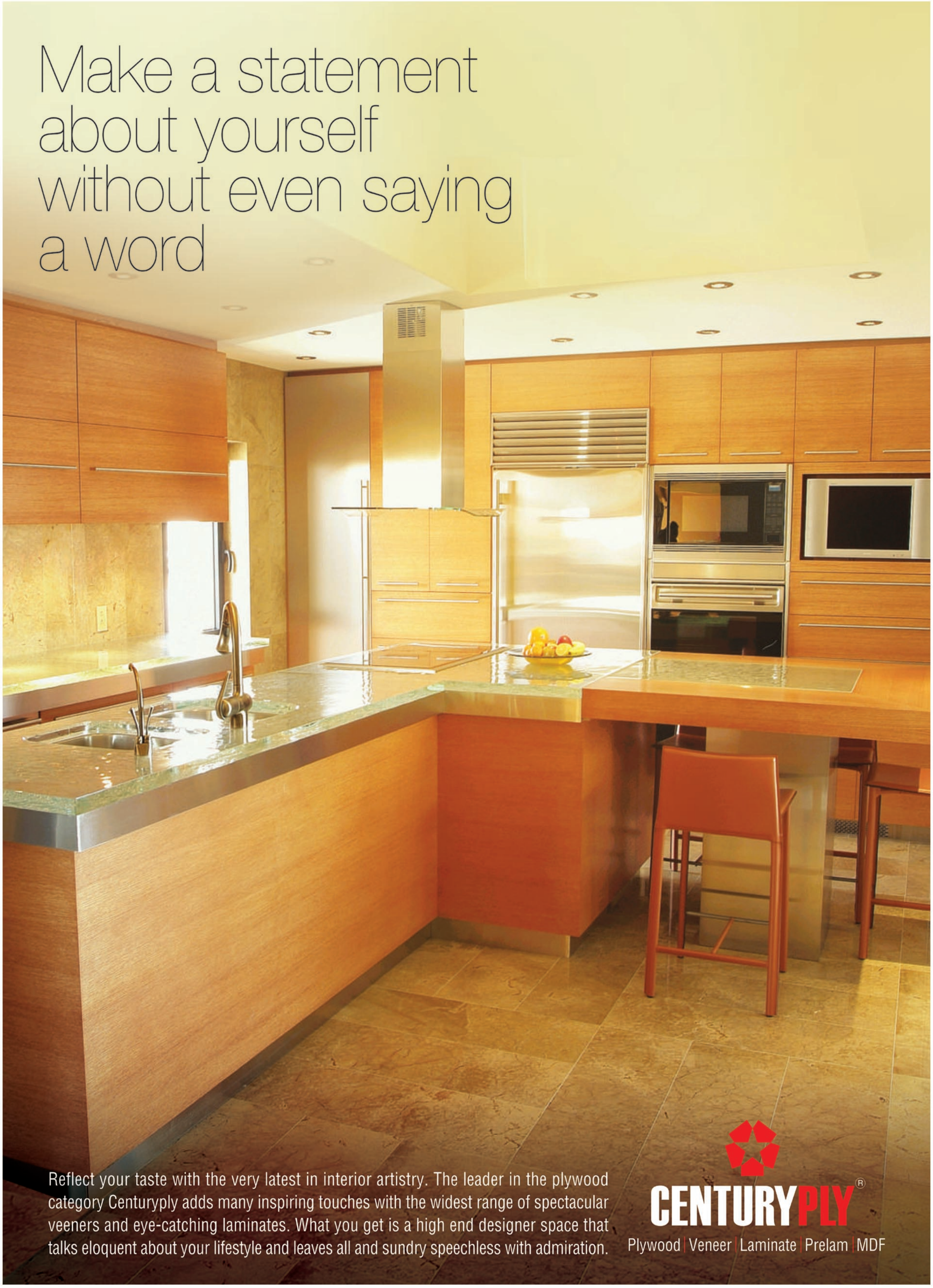

দাম : ৭.০০ টাকা